صُوَرٌ مِّنْ حَيَاةِ الْإِمَامِ الْحَسَنِ وَالْإِمَامِ الْحُسَيْنِ رضي الله عنهما

হযরত ইমাম হাসান (রাযি.)

ও

হযরত ইমাম হুসাইন (রাযি.)

মূলঃ আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহ.)
অনুবাদঃ মুহাম্মদ আবদুল হাই আল-নদভী

Est. 1998
আল্লামা শাহ্ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন
ALLAMA SHAH ABDUL JABBAR FOUNDATION

আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

হযরত ইমাম হাসান (রাযি.) ও ইমাম হযরত হুসাইন (রাযি.)
মূল: আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহ.)
অনুবাদ: মুহাম্মদ আবদুল হাই আল-নদভী

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার রিসার্চ একাডেমির পক্ষে
মিসবাহ উদ্দীন মুহাম্মদ শাহেদ, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন, বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম–৪১০০

প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ: যুলহজ ১৪৩৬ হি. = সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রি.

প্রকাশনা ক্রমিক: ১০, বিষয় ক্রমিক: ১২২

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন
নিউ মোস্তফা লাইব্রেরী, কেরানী হাট, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
মুহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার
ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী, মোস্তাফিজুর রহমান মার্কেট, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

শব্দবিন্যাস: মু. সগির আহমদ চৌধুরী
ফোন: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬, মেইল: mujahid_sach@yahoo.com

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ: সাইলেক্স, সিরাজদ্দৌলা রোড, চট্টগ্রাম

মূল্য: ১০০ [একশত] টাকা মাত্র

***Hazrat Imam Hasan (Razi.) O Hazrat Imam Husain (Razi.)*:** By: Allama Safiur Rahman Mubarakpuri, Translated In Bangla By: Mohammad Abdul Hai Nadvi, Published By: Allamah Shah Abdul Jabbar Foundation, Baitus Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price: 100 Tk

e-mail:abdulhai.nadvi@yahoo.com
saajctg@yahoo.com
www.saajbd.org

সূচিপত্র

আমাদের কথা ০৫

হযরত ইমাম হাসান ইবনে আলী (রাযি.) ০৬
পরিচয় ০৬
পিতা ০৭
মহিয়সী মাতা ০৮
পাত্রীপণ ০৯
শুভ জন্ম ১০
রাসূল (সা.)-এর দৃষ্টিতে তাঁর মর্যাদা ১৩
গুণাবলি ১৬
বিশেষ মর্যাদা ১৭
তাঁকে দেখলে স্বরণ হতো নবীজীর কথা ১৮
খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ ২০
মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাত
এড়ানো বেশি প্রশংসনীয় ২১
চরিত্র ২১
তাঁর বদান্যতা ও দয়া ২১
তাঁর ধার্মিকতা ২২
ভদ্রতা ২৩
সাহসিকতা ২৪
আলাহভীতি ২৪
অর্জিত সম্মান ২৬
জ্ঞান ২৮
যে কথায় তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রমাণ মেলে ২৯
বাকপটুতা ২৯
বক্তব্যে শালীনতা ৩০

ইন্তিকাল ৩০
কতিপয় শোকগাঁথা ৩২
উপসংহার ৩৩

হযরত ইমাম হুসাইন ইবনে আলী (রাযি.) ৩৫
শুভ আবির্ভাব ৩৫
দু'সহোদর ৩৬
নানাজান নবী করীম (সা.)-এর দৃষ্টিতে
হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর মর্যাদা ৪১
তাঁর প্রতি সাহাবাগণ (রাযি.)-এর
ভালোবাসা ও সম্মানবোধ ৪৪
তাঁর দয়া ৪৮
তাঁর ধার্মিকতা ৫১
তাঁর সাহসিকতা ও সংগ্রাম ৫৩
বাগ্মিতা ৫৫
যে কথায় তাঁর ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠে ৫৬
কারবালায় তাঁর শাহাদাত ৫৭
শোকগাঁথা ৬১
তাঁর চরিত্র ৬৩
তাঁর বাণী ৬৬
উপসংহার ৬৭

গ্রন্থপঞ্জি ৬৮

আমাদের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لله الَّذِيْ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ، أَمَا بَعْدُ!

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'হাসান ও হুসাইন জান্নাতী যুবকদের সরদার।'[১]

হযরত ইমাম হাসান (রাযি.) ও হযরত ইমাম হুসাইন (রাযি.) আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর আদরের পৌত্র। তিনি তাঁদেরকে প্রাণাধিক ভালোবাসতেন। তাঁদের মাধ্যমেই এ দুনিয়াতে মহানবী (সা.)-এর বংশধারা চালু রয়েছে।

পবিত্র মক্কা শরীফ হতে প্রকাশিত শায়খ সফীউর রহমান মুবারকপুরী (রহ.)-রচিত এ কিতাবে হযরত ইমাম হাসান (রাযি.) ও হযরত ইমাম হুসাইন (রাযি.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত ও মর্যাদা সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যা পাঠক-পাঠিকা অধ্যয়ন করে তাঁদের সঠিক মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে অবগত হতে পারবে এবং এতে আহলে বায়তের মুহাব্বত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর প্রিয় পৌত্রের জীবনাদর্শ জানার, বোঝার এবং তার ওপর আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

২০ আগস্ট ২০১৫ **মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী**
চট্টগ্রাম

---

[১] আত-তিরমিযী, ***আল-জামি'উল কবীর***, মিসর, খ. ৫, পৃ. ৬৫৬, হাদীস: ৩৭৮৬

হযরত ইমাম হাসান ইবনে আলী (রাযি.)

হযরত হাসান (রাযি.)-এর নাম উচ্চারণ করার সাথে সাথে একজন মুমিনের অন্তর ভালোবাসায় ভরে যায়। তার মনে জাগে অনন্য অনুভূতি। পুরো মুসলিম-জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁর প্রতি সেই ভালোবাসাই পোষণ করে যা তারা পোষণ করে তাঁর নানাজান মহানবী রাসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি। বিশ্বাসী মানুষের এ ভালোবাসার পিছনে অনেক কারণ আছে। প্রথমত তিনি হলেন আল্লাহর নবীর প্রিয়তম কন্যা হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (রাযি.)-এর পুত্র। অপর দিকে অনুপম চরিত্র ও ধর্মপরায়ণতার জন্যও তিনি ছিলেন বিখ্যাত। হাসান মানি হলো উত্তম। তিনি ছিলেন মহাসৌভাগ্যের অধিকারী। তাঁর চরিত্র ছিল মধুর, শারীরিক গঠন ছিল খুবই সুন্দর। তাঁর কথা-বার্তা ছিল খুবই আকর্ষণীয়। তাঁর নীরবতাও ছিল চমৎকার। দাতা হিসেবে তিনি ছিলেন উত্তম। যেকোন প্রশ্নের উত্তর দিতেন অতি চমৎকারভাবে। সাথীদের মধ্যে তিনি ছিলেন উত্তম সাথী। নির্বোধদের খারাপ আচরণ সহজেই মাফ করে দিতেন।

একজনের মধ্যে এত গুণের সমাবেশ দেখে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? যদি তাঁর নানাজান হন স্বয়ং দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহম্মদ (সা.)।

পরিচয়

তাঁর বংশধারা: হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মুনাফ। ইসলামপূর্ব জাহিলি যুগে নামটি ছিল অজ্ঞাত, তিনিই প্রথম শিশু যাঁকে 'হাসান' নামকরণ করা হয়। তাঁর ভাই হুসাইনের নামটিও ছিল অভূতপূর্ব। প্রকৃতপক্ষে হাসান-হুসাইন নামগুলো জাহেলি যুগে কারো জানা ছিল না।

عَنِ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: إِنَّ اللهَ حَجَبَ اسْمَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ حَتَّىٰ سَمَّىٰ بِهِمَا

النَّبِيّ ﷺ ابْنَيْهِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ.

হযরত মুফায্যাল বলেন, 'রাসূলুলাহ (সা.) আপন দু'নাতির নাম হাসান এবং হুসাইন রাখার পূর্বপর্যন্ত আলাহ এ দুটো নামকে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন।'[১]

তাঁর উপনাম হচ্ছে আবু মুহাম্মদ। তিনি ছিলেন রাসূল (সা.)-এর কলিজার টুকরো নাতী, হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (রাযি.)-এর পুত্র। আর ফাতিমাতুয যাহরা (রাযি.) ছিলেন হুযুর আকরম (সা.)-এর প্রিয়তমা কন্যা এবং দুনিয়ার সকল নারীদের সরদার।

তাঁর সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেন,

«إِنَّ هَذَا رَيْحَانَتِيْ وَإِنَّ ابْنِيْ هَذَا سَيِّدٌ، وَعَسَى اللهُ أَنْ يُّصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ».

'এ হচ্ছে আমার প্রিয়তম সন্তান, এ সন্তান একজন নেতা এবং আমি আশা করি, আলাহ দু'দল মুসলমানদের মধ্যে তাঁর মাধ্যমে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করবেন।'[২]

মহান আলাহ তাআলা তাঁর নবীর কথার মর্যাদা রক্ষা করেছেন। কারণ পরবর্তীকালে হযরত হাসান (রাযি.)-এর কয়েকটি বিরল গুণ যেমন– পক্ষপাতহীনতা, উচ্চতর নৈতিক মূল্যবোধ, ব্যক্তি-স্বার্থের ঊর্ধ্বে মুসলিম জাতির স্বার্থকে প্রধান্য দেওয়ার মতো বিবেচনাবোধ ও নিঃস্বার্থপরতা মুসলমানদের দু'দলের মধ্যে অনিবার্য রক্তপাত এড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পিতা

তাঁর পিতা হযরত আলী (রাযি.) ছিলেন আল্লাহর হাবীব রাসূলে করীম (সা.)-এর খুবই প্রিয়। তিনি রাসূলুলাহ (সা.)-এর ঘরেই থাকতেন। মহিলাদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত খাদীজা (রাযি.) আর পুরুষদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রাযি.)। তেমনিভাবে কিশোরদের মধ্যে প্রথমেই যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি হচ্ছেন হযরত আলী (রাযি.)। তিনি

---

[১] ইবনুল আসীর, *উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা*, খ. ২, পৃ. ১৩, জীবনী: ১১৬৫

[২] আবু নুআইম আল-আসবাহানী, *হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া*, খ. ২, পৃ. ৩৫, হযরত আবু বাকরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

জীবনে কোনদিন মূর্তিপূজা করেননি। আল্লাহ তাঁকে উপযুক্ত পুরস্কার দান করুন।

তিনি আলাহর রাসূল (সা.)-কে খুবই ভালোবাসতেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় হিজরতের রাতে। তিনি হযরতের বিছানায় রাত যাপন করেছিলেন। সেই রাতে কাফিররা নবীর বাড়ি ঘিরে রেখেছিল। সেদিন তাঁর নিহত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল প্রবল। তাবুকের যুদ্ধ ছাড়া সকল জিহাদে তিনি রাসূলে করীম (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাসূল (সা.)ও তাঁকে খুবই ভালোবাসতেন, তাঁকে অশেষ স্নেহ করতেন, তাঁর প্রতি উচ্চধারণা রাখতেন। খায়বারের যুদ্ধের সময় রাসূলে করীম (সা.) বলেছিলেন,

«لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ».

‘আগামী দিন আমি এমন একজনের হাতে পতাকা তুলে দেব যিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসেন এবং আলাহ ও রাসূলও তাঁকে ভালোবাসেন।’

এ ঘোষণা শোনে সকল সাহাবী পতাকা পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয়। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) বলেন,

«مَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ».

‘সে দিন ছাড়া আমি আর কখনো সেনাপতিত্বের জন্য এমন আগ্রহ দেখায়নি।’

পরদিন রাসূলে করীম (সা.) বললেন, ‘আলীকে আমার কাছে নিয়ে এসো।’ এরপর হযরত আলী (রাযি.) এলে তিনি তাঁর হাতে যুদ্ধের পতাকা তুলে দিলেন।[১]

হযরত আলী (রাযি.) ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, তাঁর সাহস ছিল কিংবদন্তিতুল্য। একক লড়াইয়ে তিনি সবসময় তাঁর প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে ছেড়েছেন। তিনি ছিলেন একাধারে প্রগাঢ় জ্ঞানী, তুখোড় বক্তা ও সুগঠিত দেহের অধিকারী।

মহিয়সী মাতা

তাঁর মাতা ছিলেন নবীর দুলালী হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (রাযি.)। নবীজীর অত্যন্ত প্রিয় সন্তান। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, পূত-পবিত্র

---

[১] আল-বায্যার, *আল-বাহরুয যাখ্খার*, খ. ১৬, পৃ. ২৩, হাদীস: ৯০৫৪, হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

চরিত্রের অধিকারী, সতী-সাধ্বী আর আল্লাহর ইবাদতের প্রতি খুবই অনুগত। আলাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রতি গভীর ঈমান নিয়েই তিনি বেড়ে উঠেছেন। তাঁর মায়ের নাম হযরত খাদীজা বিনতে খুওয়ালিদ (রাযি.)। যিনি রাসূলে করীম (সা.)-এর ওপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিলেন। তাঁকে ইসলামের প্রথমিক যুগে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য ও সমর্থন করেছিলেন। হযরত ফাতিমা (রাযি.) হলেন বিশ্বনারীদের সরদার। আলাহ্র রাসূল (সা.) তাঁকে খুবই ভালোবাসতেন। তিনি বলেছেন,

«فَإِنَّمَا ابْنَتِيْ بَضْعَةٌ مِّنِّيْ، يَرِيْبُنِيْ مَا رَابَهَا وَيُؤْذِيْنِيْ مَا آذَاهَا».

'ফাতিমা আমার অংশ, যে তাঁকে ইনকার (ঘৃণা) করে সে আমাকে ইনকার করে, যে তাঁর ক্ষতি করে সে আমারই ক্ষতি করে।'[১]

হযরত ফাতিমা (রাযি.) অবশ্যই এ ভালোবাসার উপযুক্ত পাত্রী ছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন অতি-বিনয়ী, সদাচারী, হৃদয়বতী ও অতিশয় ধর্মপরায়ণা।

পাত্রীপণ

হযরত আলী (রাযি.) হযরত ফাতিমা (রাযি.)-কে বিয়ের প্রস্তাব দিলে হুযুর করীম (সা.) খুবই আনন্দিত হন। কারণ তিনি হযরত আলী (রাযি.)-কে ভালোভাবে জানতেন। তিনি তাঁকে ছোট বেলায় তাঁর চাচা আবু তালিবের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে নিজে লালন-পালন করেছিলেন, যাতে চাচজানের সাংসারিক খরচের কিছুটা লাঘব হয়। তিনি সত্যপরায়ণতা, অতুলনীয় সাহস, সত্যের ওপর দৃঢ়তা ও ইসলাম প্রচারে তার আন্তরিকতা সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত ছিলেন।

রাসূলে করীম (সা.) হযরত আলী (রাযি.)-এর আর্থিক সঙ্গতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই তিনি তাঁর কাছে কোন পাত্রীপণ দাবি করেননি। এটি হযরত আলী (রাযি.)-এর জন্য বোঝা-স্বরূপ হতো। তাই এ বিয়েতে হযরত আলী (রাযি.)-এর পক্ষ থেকে যৌতুক ছিল একটি লৌহ নির্মিত বর্ম।

হযরত আলী (রাযি.) বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলে রাসূলে করীম (সা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করেলেন, 'তোমার হুতামিয়া (হুতামিয়া এক প্রকার ভারী

---

[১] (ক) ইবনুল আসীর, *উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা*, খ. ৭, পৃ. ২১৬, জীবনী: ৭১৮৩; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৯০২, হাদীস: ২৪৪৯, হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

লৌহবর্ম। আবদুল কায়েস গোত্রের হুতামিয়া ইবনে মুহারিবের নামে এ লৌহবর্মের নামকরণ হয়েছিল। কারণ তিনিই তা প্রস্তুত করেছিলেন) কোথায়? হযরত আলী জবাবে বললেন, তা আমার কাছে আছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর রাসূল (সা.) বললেন, 'সেটা তাঁকে (পাত্রীপণ হিসেবে) দিয়ে দাও।'[১]

হযরত ইমাম হাসান (রাযি.) ছিলেন এ দুই পবিত্র নর-নারী মিলনের ফল। তাঁর কাছ থেকে আমরা কী আশা করতে পারি, যার মাতামহ ছিলেন রাসূলে পাক (সা.)-এর কন্যা, যার মাতামহী ছিলেন প্রথম ইসলাম গ্রহণকারিণী হযরত খাদীজা বিনতে খুওয়ালিদ (রাযি.), যার মা ছিলেন নারীর সরদার হযরত ফাতিমা (রাযি.) ও বাবা ছিলেন হযরত আলী (রাযি.)। সর্বোত্তম গাছ থেকে আমরা কি সর্বোত্তম ফসল প্রত্যাশা করি না?

শুভ জন্ম

হিজরী তৃতীয় সনে রমযানের মধ্যবর্তী সময়ে হযরত হাসান (রাযি.)-এর জন্ম হয়। কোন কোন বর্ণনা মতে তাঁর জন্ম হয়েছিল তৃতীয় হিজরী সনের মধ্য শা'বানে, বদর যুদ্ধের এক বছর পরে।

عَنْ قَابُوْسَ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ الْفَضْلِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! رَأَيْتُ كَأَنَّ فِيْ بَيْتِيْ عُضْوًا مِّنْ أَعْضَائِكَ، قَالَ: «خَيْرًا رَأَيْتِ، تَلِدُ فَاطِمَةُ غُلَامًا فَتُرْضِعِيْهِ»، فَوَلَدَتْ حُسَيْنًا، أَوْ حَسَنًا، فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ قُثَمٍ.

'হযরত কাবুস ইবনে মুখারিখ (রহ.)-এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, হযরত উম্মুল ফযল (রাযি.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! স্বপ্নে আমার মনে হল আমি যেন আপনার শরীরের একটি অংশ আমার ঘরে দেখেছি। তিনি বললেন, 'তুমি যা দেখেছ ভালোই দেখেছ। ফাতিমা এক সন্তান জন্ম দেব। তাঁকে কুসাম (হযরত কুসাম হলেন হযরত উম্মুল ফযলের ছেলে)-এর দুধ থেকে খাওয়ানো হবে।' অতঃপর হযরত হাসান (রাযি.)-এর জন্ম হয় এবং তাঁকে কুসমের দুধ থেকে খাওয়ানো হয়।'[২]

---

[১] (ক) ইবনুল আসীর, *উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা*, খ. ৭, পৃ. ২১৬, জীবনী: ৭১৮৩ (হাদীস: ২৩৪৫); (খ) আদ-দূলাবী, *আয-যুররিয়াতুত তাহিরা*, পৃ. ৬৩–৬৪, হাদীস: ৯২; (গ) আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরীয়ত*, খ. ৩, পৃ. ১৬০, হাদীস: ১০২২, হযরত হযরত আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত

[২] ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ১২৯৩, হাদীস: ৩৮৯৩

এভাবে হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর উক্তি সত্যে পরিণত হয়। কারণ তিনি কখনো মনগড়া কথা বলতেন না। এভাবে আল্লাহর নবীর প্রিয় নাতি জন্মগ্রহণ করেন এবং হযরত উম্মুল ফযল (রাযি.) তাঁকে লালন-পালন করেন।

عَنْ سَوْغَةَ بِنْتِ مِسْرَحٍ، قَالَتْ: كُنْتُ فِيْمَنْ حَضَرَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حِيْنَ ضَرَبَهَا الْـمَخَاضُ، قَالَتْ: فَأَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «كَيْفَ هِيَ؟ كَيْفَ هِيَ ابْنَتِيْ، فَدَيْتُهَا»؟ قَالَتْ: قُلْتُ: إِنَّهَا لَتَجْهَدُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: «فَإِذَا وَضَعَتْ فَلَا تَسْبِقِيْنِيْ بِهِ بِشَيْءٍ»، قَالَتْ: فَوَضَعَتْ، فَسَرَرْتُهُ، وَلَفَفْتُهُ فِيْ خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَا فَعَلَتْ ابْنَتِيْ، فدتها، وَمَا حَالُـهَا، وَكَيْفَ هِيَ؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَضَعَتْهُ، وَسَرَرْتُهُ، وَجَعَلْتُهُ فِيْ خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ، فَقَالَ: «لَقَدْ عَصَيْتِنِيْ»، قَالَتْ: قُلْتُ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ مَّعْصِيَةِ اللهِ وَمَعْصِيَةِ رَسُوْلِهِ، سَرَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ! وَلَـمْ أَجِدْ مِنْ ذَلِكَ بُدًا، قَالَ: «إِيْتِيْنِيْ بِهِ»، قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ بِهِ، فَأَلْقَىٰ عَنْهُ الْـخِرْقَةَ الصَّفْرَاءَ، وَلَفَّهُ فِيْ خِرْقَةٍ بَيْضَاءَ، وَتَفَلَ فِيْ فِيْهِ، وَأَلْبَاهُ بَرِيْقِهِ، قَالَتْ: فَجَاءَ عَلِيٌّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا سَمَّيْتَهُ يَا عَلِيُّ!»؟ قَالَ: سَمَّيْتُهُ جَعْفَرًا يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهُ حَسَنٌ، وَبَعْدَهُ حُسَيْنٌ، وَأَنْتَ أَبُو الْـحَسَنِ وَالْـحُسَيْنِ».

‘হযরত সওগা বিনতে আল-মিসরাহ (রাযি.) বলেন, হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর প্রসব-বেদনার সময় আমিও উপস্থিত ছিলাম। আল্লাহর রাসূল (সা.) আমদের কাছে এসে বললেন, ‘আমার মেয়ের অবস্থা কেমন? আমি কি তাঁর জন্য কুরবান হয়ে যেতে পারি?’ আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! তাঁর প্রসব-বেদনা শুরু হয়েছে! তিনি বললেন, ‘তাহলে বাচ্ছা ভূমিষ্ট হওয়ার পর আমাকে না জানিয়ে তোমরা কিছু করতে যেয়ো না।’ এরপর শিশু ভূমিষ্ট হলে আমি তাঁর নাড়ি কাটলাম এবং একটি হলুদ কাপড়ে জড়িয়ে নিলাম। তারপর আল্লাহর হাবীব (সা.) এলেন এবং বললেন, ‘আমার মেয়ের অবস্থা কেমন? আমি তার জন্য কি কুরবানী দিতে পারি? এখন সে কেমন

আছে?' আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! আমি বাচ্চার ডেলিভারি করিয়েছি, তাঁর নাড়ি কেটেছি এবং হলুদ কাপড়ে তাঁকে আচ্ছাদিত করেছি। তিনি বললেন, 'তুমি আমার কথার অবাধ্য হয়েছ।' আমি বললাম, আমি আলাহর ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর অবাধ্য হওয়ার আপরাধ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি তাঁর নাড়ি কর্তন করেছি। কারণ তা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। তিনি বললেন, 'তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' নবীজি (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী আমি তাঁকে উপস্থিত করলাম, তিনি হলুদ কাপড় সরিয়ে তাঁকে সাদা কাপড়ে জড়িয়ে নিলেন। তিনি নিজের থুথু মুবারক নিলেন এবং তা তাঁর মুখে দিলেন। এরপর হযরত আলী (রাযি.) আসলে আল্লাহর রাসূল (সা.) তাঁকে বললেন, 'তুমি তাঁর কী নাম রেখেছ?' তিনি বললেন, ইয়া রাসূলালাহ (সা.)! আমি তাঁর নাম রেখেছি জা'ফর। রাসূল (সা.) বললেন, 'না। তাঁর নাম হবে হাসান এবং পরে যে জন্ম নেবে তাঁর নাম হবে হুসাইন। তুমি হবে আবুল হাসান ও আবুল হুসাইন।''[১]

এভাবেই হযরত হাসান (রাযি.)-এর দুনিয়াতে শুভাগমন ঘটে। জন্মের পর হতেই তিনি রাসূলে করীম (সা.)-এর প্রত্যক্ষ আদরে, যত্নে, স্নেহে ও তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হতে থাকেন।

عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ، قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ حَسَنًا ﷺ، قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَلَا أَعُقُّ عَنِ ابْنِيْ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنِ احْلِقِيْ رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِيْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقًا » - أَوْ قَالَ: «فِضَّةً - عَلَى الْمَسَاكِيْنِ».

হযরত আবু রাফি (রাযি.) বর্ণনা করেন, 'হযরত হাসান (রাযি.)-এর জন্মের পর হযরত ফাতিমা (রাযি.) বলেন, ইয়া রাসূলালাহ! আমি আমার ছেলের জন্য কি একটি পশু যবাই করব না? তিনি বললেন, 'না। বরং তার মাথা কামাও, তার চুলের ওজনের পরিমাণ রুপা দরিদ্রের মাঝে দান করে দাও।'[২]

---

[১] (ক) আবু নুআইম আল-আসবাহানী, ***মা'রিফাতুস সাহাবা***, খ. ৬, পৃ. ৩৩৫৯–৩৩৬০, হাদীস: ৭৬৮৭; (খ) ইবনে আসাকির, ***তারীখু দামিশক***, খ. ১৩, পৃ. ১৬৯; (গ) আল-মিয্যী, ***তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল***, খ. ৬, পৃ. ২২২–২২৩, ক্র. ১২৪৮

[২] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, ***আল-মুসনদ***, খ. ৪৫, পৃ. ১৬৩, হাদীস: ২৭১৮৩; (খ) আত-তাবারানী, ***আল-মু'জামুল কবীর***, খ. ১, পৃ. ৩১০, হাদীস: ৯১৭ ও খ. ৩, পৃ. ৩৩০, হাদীস: ২৫৭৬

অতএব হযরত ফাতিমা (রাযি.) তাই করলেন। হযরত রাসূলে মাকবুল (সা.) তাঁর প্রিয় নাতির মুখে আপন লালা প্রবেশ করিয়ে ক্ষান্ত হননি। তিনি তাঁর মুবারক কণ্ঠস্বরকেও প্রথমে তাঁর কানে প্রবেশ করিয়েছেন। আর তা ছিল আযানের ধ্বনি। রাসূল (সা.) হযরত হাসান (রাযি.)-এর আযান শুনিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, সৃষ্টিকুলের মাঝে সবচেয়ে সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ছিল হুযুর পুরনূর (সা.)-এর।

হযরত হাসান (রাযি.)-এর জন্মের সপ্তম দিন রাসূলে করীম (সা.) তাঁর আকীকা প্রদান করেন। হযরত আব্বাস (রাযি.) বলেন, 'হুযুর করীম (সা.) হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রাযি.) উভয়ের আকীকার জন্য একটি করে মেষ যবেহ করেছিলেন।'

রাসূল (সা.)-এর দৃষ্টিতে তাঁর মর্যাদা

আমরা দেখেছি হুযুর পুরনূর (সা.) হযরত হাসান (রাযি.)-এর প্রতি কেমন যত্ন নিয়েছেন, এমনকি তাঁর জন্মের পূর্ব হতে কেমন সজাগ ছিলেন, কিভাবে তাঁর প্রথম আচ্ছাদনের কাপড় বদলিয়ে দিয়েছেন, কেমন করে তাঁর কানে আযান ফুঁকারি দিয়েছিলেন, কীভাবে তাঁর তাহনীক (এটি একটা ইসলামি পদ্ধতি। বাচ্চা জন্মগ্রহণের পর খেজুর অথবা এ জাতিয় কিছু চিবিয়ে এর রস প্রথম খাবাররূপে বাচ্চার মুখে দেওয়া এবং এরপর তার কানে আযান দেওয়া) করেছিলেন, নিজের থুথু মুবারক তাঁর মুখে দিয়েছিলেন এবং জাফর নাম বদলিয়ে তাঁর নাম হাসান রেখেছিলেন।

আলাহর হাবীব (সা.)-এর এ স্নেহ, আদর ও যত্ন তাঁর প্রতি শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। হযরত হাসান (রাযি.) ও তাঁর প্রতি এতই অনুরক্ত ছিলেন যে, তিনি তাঁকে পিতা বলে সম্বোধন করতেন। বলতেন, 'হে আমার পিতা!' এমন কি তা করতেন পিতা হযরত আলী (রা.)-এর উপস্থিতিতেও। এভাবে আল্লাহর নবী (সা.)-এর প্রতি তাঁর অতুলনীয় অনুরাগের প্রকাশ ঘটত।

عَنْ أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ، يَقُوْلُ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَيُّ أَهْلِ بَيْتِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ». وَكَانَ يَقُوْلُ لِفَاطِمَةَ: «ادْعِيْ لِيَ ابْنَيَّ»، فَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا إِلَيْهِ.

'হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) বর্ণনা করেন, আলাহর রাসূল (সা.)-কে যখন জিজ্ঞেস করা হত, আপনার পরিবারের কে আপনার

কাছে সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বলতেন, 'হাসান ও হুসাইন।' তিনি তাদের নাক টিপে দিতেন ও জড়িয়ে ধরতেন।'[১]

প্রায় সময়ই হযরত হাসান (রাযি.) আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর কাছাকাছি থাকতেন, তাঁর সাথে খেলাধুলা করতেন। তিনি তা খুবই উপভোগ করতেন এবং হযরত হাসান (রাযি.)-এর শিশুসুলভ চপলতার কোন বিরক্ত হতেন না।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ، فَكَانَ يُصَلِّيْ، فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا فَوَضَعَهُمَا وَضْعًا رَفِيْقًا، فَإِذَا عَادَ عَادًا، فَلَمَّا صَلَّىٰ جَعَلَ وَاحِدًا هَا هُنَا وَوَاحِدًا هَا هُنَا، فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَلَا أَذْهَبُ بِهِمَا إِلَىٰ أُمِّهِمَا؟ قَالَ: «لَا» فَبَرَقَتْ بَرْقَةً، فَقَالَ: «الْحَقَا بِأُمِّكُمَا» فَمَا زَالَا يَمْشِيَانِ فِيْ ضَوْئِهَا حَتَّىٰ دَخَلَا.

'হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আমরা একদিন হুযুর করীম (সা.)-এর সাথে ইশার নামায আদায় করছিলাম। তিনি সিজদায় গেলে হাসান ও হুসাইন তাঁর পিঠে উঠে বসল, যখন সিজদা থেকে মাথা মুবারক উঠালেন আলতোভাবে তাদেরকে নামিয়ে রাখলেন। আবার সিজদায় গেলে তারা আবারও পিঠে চড়ে বসল। নামায শেষে আমি বললাম, আমি কি তাঁদেরকে মায়ের কাছে রেখে আসব? তখনই বিদ্যুত চমকাতে লাগল এবং সে আলোতে তারা মায়ের ঘরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত পরিদৃশ্যমান থাকল।'[২]

এতে কি হযরত হাসান (রাযি.) ও তাঁর ভাইয়ের প্রতি আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর গভীর মমতার কথা প্রকাশ হয় না? বিশেষত নামাযরত অবস্থায় তিনি তাঁদের ব্যাপারে যে ধৈর্যের পরিচয় তা অপূর্ব। কারণ নামাযকেই তিনি ঘোষণা করেছেন তাঁর জন্য নয়নপ্রীতিকর বলে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ إِحْدَىٰ صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ، الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، وَهُوَ حَامِلٌ الْحَسَنَ أَوِ الْحُسَيْنَ، فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ، فَصَلَّىٰ، فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ،

---

[১] আত-তিরমিযী, *আল-জামি' উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৬৫৭, হাদীস: ৩৭৭২

[২] আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, খ. ৩, পৃ. ১৮৩, হাদীস: ৪৭৮২

سَجْدَةً أَطَالَهَا، فَقَالَ: إِنِّيْ رَفَعْتُ رَأْسِيْ، فَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَىٰ ظَهْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَرَجَعْتُ فِيْ سُجُودِيْ، فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ، قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِكَ، هَذِهِ سَجْدَةً قَدْ أَطَلْتَهَا، فَظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، أَوْ أَنَّهُ يُوْحَىٰ إِلَيْكَ، قَالَ: «فَكُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِيْ ارْتَحَلَنِيْ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّىٰ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ».

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রাযি.)-এর বরাতে তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল (সা.) একদিন আমার কাছে এলেন, তাঁর কোলে ছিল হাসান বা হুসাইন। তিনি অগ্রসর হয়ে তাঁকে নিচে রাখলেন। তারপর নামাযের তাকবীর বলে সিজদায় গেলেন। তিনি সিজদায় খুব দেরি করলেন। আমি মাথা উঠিয়ে দেখলাম শিশুটি তাঁর পিঠে বসে আছে। তা দেখে আমি আবার সিজদায় চলে গেলাম। নামায শেষ হলে লোকজন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! আপনি সিজদায় আজ বেশি দেরি করেছেন। তিনি বললেন, ‘শিশুটি আমার পিঠে বসা অবস্থায় ছিল। তাঁর খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁকে অবকাশ না দেওয়া আমি অপছন্দ করি।’’[১]

আলাহর নবী হুযুর (সা.) প্রায় সময়ই তাকে চুমু খেতেন ও কাঁধে তুলে নিতেন।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَامِلَ الْحُسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: نِعْمَ الْمَرْكَبُ رَكِبْتَ يَا غُلَامُ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ».

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, একবার আলাহর রাসূল (সা.) হযরত হাসান (রাযি.)-কে কাঁধে নিয়ে বের হলেন। একজন বলল, হে শিশু! কি চমৎকার বাহনই না তুমি পেয়েছ! নবী করীম (সা.) বললেন, ‘আরোহী হিসেবে সেও খুব চমৎকার।’’[২]

এসব ঘটনায় হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর স্নেহভাজন নাতির

---

[১] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২৫, পৃ. ৪১৯–৪২০, হাদীস: ১৬০৩৩; (খ) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান*, খ. ২, পৃ. ২২৯, হাদীস: ১১৪১

[২] আত-তিরমিযী, *আল-জামি‘উল কবীর*, মিসর, খ. ৫, পৃ. ৬৬১, হাদীস: ৩৭৮৪

প্রতি গভীর মমতা প্রকাশ পায়। এছাড়াও অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে যাতে অন্যন্য ভালোবাসার প্রমাণ মিলে।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵁، كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْخُذُنِيْ فَيُقْعِدُنِيْ عَلَىٰ فَخِذِهِ، وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ عَلَىٰ فَخِذِهِ الْأُخْرَىٰ، ثُمَّ يَضُمُّهُمَا، ثُمَّ يَقُوْلُ: «اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا، فَإِنِّيْ أَرْحَمُهُمَا».

'হযরত উসামা (রাযি.) বলেন, নবী করীম (সা.) তাঁকে ও হাসানকে কাছে ডেকে নিতেন আর বলতেন, 'হে আলাহ! তাঁদের দু'জনকেই ভালোবাসুন কারণ আমি তাঁদের ভালোবাসি।''[১]

তাছাড়া নবী করীম (সা.) মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

«مَنْ أَحَبَّنِيْ فَلْيُحِبَّهُ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ».

'যে আমাকে ভালোবাসে, সে যেন হাসানকেও ভালোবাসে, যারা উপস্থিত আছ তারা অনুপস্থিতদের একথা জানিয়ে দিও।'[২]

গুণাবলি

হযরত হাসান (রাযি.)-এর চরিত্র ছিল অনুপম। স্বভাব ছিল অমায়িক। তিনি একাধারে ছিলেন ভদ্র, সুন্দর, মর্যাদাবান, উদার, দয়ালু, ধর্মপরায়ণ ও বিনয়ী। আর সুন্দর ও আকর্ষণীয় দেহ সৌষ্ঠব ও অনুপম চরিত্র কোন বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল না। কারণ তিনি ছিলেন আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দৌহিত্র। সাধারণত মানুষ তাদের ঘনিষ্টজনের শারীরিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকে।

عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُوْلُ «كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَشْبَهَهُمْ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ».

'আয-যুহরী (রহ.) হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.)-এর বরাত দিয়ে বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর চেহারা মুবারকের সাথে সবচেয়ে বেশি মিল ছিল হযরত হাসান (রাযি.)-এর।'[১]

---

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৮, পৃ. ৮, হাদীস: ৬০০৩

[২] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩৮, পৃ. ১৯২, হাদীস: ২৩১০৬

বিশেষ মর্যাদা

আলাহ্‌র হাবীব রাসূলে করীম (সা.) বলেন, 'হাসান এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী এবং সে এক পুণ্যময় কর্ম সম্পাদন করবে। তা হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর মাধ্যমে মুসলমানদের দু'বিবাদমান দলের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্টা করবেন।' পরবর্তীতে হুবহু তাই ঘটেছিল।

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ رضي الله عنه، أَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الْحَسَنَ، فَصَعِدَ بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «ابْنِيْ هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُّصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ».

'হযরত আবু বকরা (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলে করীম (সা.) একদিন খুতবা দিতে মিম্বরে আরোহণ করলেন। তখন হযরত হাসান (রাযি.) এসে মিম্বরে উঠে পড়লে তিনি বলেন, 'এই বালক একজন নেতা, আলাহ তাঁর মাধ্যমে মুসলমানদের বড় দু'দলের মাঝে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করবেন।''[২]

عَنْ حُذَيْفَةَ: سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: «هَذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلْ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُّسَلِّمَ عَلَيَّ، وَيُبَشِّرَنِيْ بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

'হযরত হুযায়ফা (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হুযুর আকরম (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'এ এমন এক ফেরেশতা যিনি ইতঃপূর্বে আর কখনো পৃথিবীতে অবতরণ করেননি, আমাকে সালাম পেশ করার জন্য তিনি মহান প্রভুর কাছে অনুমতি গ্রহণ করেছেন, তিনি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, ফাতিমা বেহেশতের নারীদের সরদার আর হাসান ও হুসাইন তরুণদের সরদার।''[৩]

---

[১] (ক) আস-সান'আনী, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ৪, পৃ. ৩৩৫, হাদীস: ৭৯৮০; (খ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি' উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৬৫৯, হাদীস: ৩৭৭৬

[২] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ২০৪–২০৫, হাদীস: ৩৬২৯; (খ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি' উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৬৫৮, হাদীস: ৩৭৭৩; (গ) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ১০৭, হাদীস: ১৪১০

[৩] (ক) আত-তিরমিযী, *আল-জামি' উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৬৬০–৬৬১, হাদীস: ৩৭৮১; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৩, পৃ. ২৫২

রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, 'হাসান হল আসবত হতে উদ্ভূত এক সিবত' অর্থাৎ উত্তম জাত থেকে উদ্ভূদ এক উত্তম জাত।' *[সুনানুত তিরমিযী]*

এমন সুমহান মর্যাদা সম্মানের এমন গৌরবময় আসন আর কারও ভাগ্যে জুটেনি। তার গুণাবলি অসংখ্য। সাইয়িদুল মুরসালীনের সাথে তাঁর রক্ত সম্পর্কের কথা চিন্তা করলে কারও তাঁর তুলানা হয় না।

তাঁকে দেখলে স্বরণ হতো নবীজীর কথা

হযরত হাসান (রাযি.)-এর চেহারা হুযুর করীম (সা.)-এর চেহারা মুবারকের অপূর্ব মিল ছিল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আয-যুহরী হযরত হাসান (রাযি.)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন, নবী পরিবারের সদস্যদের মধ্যে হযরত হাসান (রাযি.)-এর চেহারা রাসূল (সা.)-এর চেহারা মুবারকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল।[১]

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «الْـحَسَنُ أَشْبَهُ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ، وَالْـحُسَيْنُ أَشْبَهُ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ».

'হযরত আলী (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, হাসানের মুখমণ্ডল হতে নাভী পর্যন্ত এবং হুসাইনের নাভী হতে নিম্নাংশ রাসূল (সা.)-এর চেহারা মুবারকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল।'[২]

এ বিষয়ে সকল হাদীস শরীফে সমর্থন পাওয়া যায়। তাই হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর ইন্তিকালের পর যখনই সম্মানিত সাহাবীগণ হযরত হাসান (রাযি.)-এর দেখা পেতেন তখনই তাঁদের মনে প্রিয় নবী (রাযি.)-এর স্মৃতি উদয় হতো। তাঁদের মনে পড়ে যেত, তাঁর চাল-চলন, কথাবার্তা, আচার-আচারণ ইত্যাদি সব তাঁদের হৃদয়-মন নবী প্রেমে উদ্বেল হয়ে যেত। তাঁদের চোখ হয়ে উঠতো অশ্রুসজল। তাঁদের অনেকেই ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠতেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ الْـحَسَنَ إِلَّا فَاضَتْ عَيْنِيْ أَوْ دَمَعَتْ عَيْنِيْ، أَوْ بَكَيْتُ، شَكَّ الْـخَيَّاطُ».

'হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, এমন কোন সময় অতিবাহিত

---

[১] আস-সান'আনী, ***আল-মুসান্নাফ***, খ. ৪, পৃ. ৩৩৫, হাদীস: ৭৯৮০

[২] আত-তিরমিযী, ***আল-জামি'উল কবীর***, মিসর, খ. ৫, পৃ. ৬৬০, হাদীস: ৩৭৭৯

হয়নি, যখন আমি হযরত হাসান (রাযি.)-কে দেখেছি অথচ আমার চোখে কান্না ঝরেনি।'[১]

এটা এ জন্য হতে পারে যে, হযরত হাসান (রাযি.) সদা-সর্বদা নবীজি (সা.)-এর পাশে থাকতেন, কখনো কাজ ছাড়া হতেন না। তিনি নবীজি (সা.)-এর খুতবা প্রদানের সময় মিম্বরে উঠে পড়তেন নামাযের সময় তাঁর পিঠ মুবারকে চড়ে বসতেন। তাই যখনই সাহাবী হযরত হাসান (রাযি.)-কে দেখতেন তখনই তাঁদের মনে হতো তিনি নবীজি (সা.)-এর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بِلَيَالٍ، وَعَلِيٌّ ﵁ يَمْشِيْ إِلَىٰ جَنْبِهِ، فَمَرَّ بِحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَلْعَبُ مَعَ غِلْمَانٍ، فَاحْتَمَلَهُ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ: «وَا بِأَبِيْ شَبَهُ النَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيْهًا بِعَلِيٍّ»، قَالَ: وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ.

'হযরত উকবা ইবনুল হারিস (রাযি.) বলেন, নবী করীম (সা.)-এর ইন্তিকালের দিন কয়েক পরে আসরের নামায শেষে আমি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর সাথে বের হলাম। হযরত আলী (রাযি.) তাঁর পাশে ছিলেন। কিছু দূরে হযরত হাসান (রাযি.) সমবয়সী বালকদের সাথে খেলছিলেন। তিনি তাঁকে আপন কাঁধে তুলে নিয়ে বললেন, সে হয়েছে নবী করীম (সা.)-এর মতো, আলীর মতো নয়। এতে আলী (রাযি.) হাসলেন।'[২]

তাঁদের এ অকৃত্রিম ও গভীর ভালোবাসা ছিল হযরত নবী করীম (সা.)-এর সে ঘোষণারই প্রতিপলন যাতে তিনি বলেছিলেন,

«مَنْ أَحَبَّنِيْ فَلْيُحِبَّهُ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ».

'যে আমাকে ভালোবাসে, যেন হাসানকেও ভালোবাসে, যারা উপস্থিত আছ তারা অনুপস্থিতদের একথা জানিয়ে দিও।'[৩]

---

[১] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১৬, পৃ. ৫১৮, হাদীস: ১০৮৯১

[২] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১, পৃ. ২২৩, হাদীস: ৪০

[৩] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩৮, পৃ. ১৯২, হাদীস: ২৩১০৬

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ

হিযরী ৪০ সনের রমযানের ১৩ দিন বাকি থাকতে হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.) ইরাকের কুফা নগরীতে শহীদ হন। সবার দৃষ্টি তখন হযরত হাসান (রাযি.)-এর দিকে। কারণ তিনি ছিলেন শহীদ খলীফা হযরত আলী (রাযি.)-এর বড় ছেলে। আল্লাহর নবী (সা.) সম্মানিত সাহাবাগণের বর্ণনার বাইরেও তিনি ছিলেন সর্বজন প্রশংসিত, সত্যপন্থী, দানশীল, সাহসী, ভদ্র, বিনয়ী ও ধৈর্যশীল। তাঁর ব্যাপারে সমসমায়িক সবাই ঐক্যমত পোষণ করেন। তিনি তাঁদের কাছে গেলেন এবং ভাবগম্ভীর ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় এক বক্তব্য রাখলেন। তাঁর কতিপয় কথা ছিল নিম্নরূপ:

«لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ بِالْأَمْسِ مَا سَبَقَهُ الْأَوَّلُوْنَ بِعِلْمٍ، وَلا أَدْرَكَهُ الْآخِرُوْنَ، إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، لَيَبْعَثُهُ وَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ، فَلا يَنْصَرِفُ حَتَّىٰ يُفْتَحَ لَهُ، وَمَا تَرَكَ مِنْ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ، إِلَّا سَبْعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ عَطَائِهِ كَانَ يَرْصُدُهَا لِخَادِمٍ لِأَهْلِهِ».

> ‘এ রাতে এমন একজন মহান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছেন পূর্ব ও পর প্রজন্মে যার সমকক্ষ কেউ ছিল না। আলাহর প্রিয় নবী রাসূলে মাকবুল (সা.) তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন যুদ্ধের পতাকা, আলাহ বিজয় না দেওয়া পর্যন্ত তিনি কোন দিন লড়াই থেকে বিরত হননি। তিনি কোন সোনা অথবা রুপা রেখে যাননি। রেখে গেছেন মাত্র ৭০০ দিরহাম যা দিয়ে তিনি আপন পরিবারের জন্য একজন খাদেম নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন।’[১]

অতঃপর তিনি নিজেকে জনসাধারণের কাছে পেশ করলেন এবং তাঁদের বাইয়াত কামনা করলেন। জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসে তাঁর প্রতি অনুগত্য প্রকাশ করল। তাঁরা আপদে-বিপদে সর্বদা তাঁকে সাহায্য করার ওয়াদা দিল। তাঁদের সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার। তারা ইতঃপূর্বে হযরত আলী (রাযি.)-এর প্রতি অমৃত্যু অনুগত ছিল। তাঁরা সবাই হযরত হাসান (রাযি.)-এর প্রতি আরও আনুগত্য ও ভালোবাসা প্রকাশ করল। তিনি সাত মাসব্যাপী ইরাক, খুরাসানের (উত্তর ইরানের) বাইরের অঞ্চল, হিজায ও ইয়ামেনের খলীফা ছিলেন।

---

[১] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩, পৃ. ২৪৭, হাদীস: ১৭২০

মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাত এড়ানো বেশি প্রশংসনীয়

এদিকে শামে (সিরিয়ায়) হযরত মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাযি.)-এর প্রতি সেখানকার লোকজন আনুগত্য প্রকাশ করেছিল। তিনি জানতেন হযরত হাসান (রাযি.) মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ খুবই অপছন্দ করতেন। তাই তিনি তাঁকে নিজেদের মধ্যে সন্ধি করার প্রস্তাব দিলেন। তাতে শর্ত থাকবে যে, হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর কিছু হলে তখন যদি হযরত হাসান (রাযি.) বেঁচে থাকেন তাঁকে খিলাফতের দায়িত্ব দেবেন অর্থাৎ হযরত মুআবিয়া (রাযি.) প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি হযরত হাসান (রাযি.)-কে খিলাফত ফিরিয়ে দেবেন, যদি তার কিছু হয় এবং যদি হযরত হাসান বেঁচে থাকেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযি.) বর্ণনা করেন, হযরত হাসান বললেন, আমি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, আমি চাই যে, আপনি এ বিষয়ে আমাকে সমর্থন করবেন। আমি বললাম, তা কী? তিনি জবাব দিলেন, আমার অভিমত হচ্ছে যে, আমি মদীনা শরীফে ফিরে যাই এবং হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)-এর পক্ষে খিলাফত পরিত্যাগ করি। কারণ এ বিভেদ যথেষ্ট দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে, অনেক রক্ত ঝরেছে এবং অবাধ চলাচল অসম্ভব হয়ে ওঠেছে। আমি তাঁকে বললাম, আল্লাহ আপনাকে পুরস্কারে ভূষিত করুন। কারণ আপনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতদেরকে রক্তপাত থেকে রক্ষা করেছেন।[১]

এভাবে হযরত হাসান (রাযি.) হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)-এর পক্ষে খিলাফতের দাবি পরিত্যাগ করেন। অথচ তিনিই ছিলেন খিলাফতের অধিক হকদার। শুধু মুসমানদের মধ্যে সম্ভাব্য রক্তপাত এড়াতেই তিনি ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন।

চরিত্র

হুযুর করীম (সা.)-এর চেহারা মুবারকের সাথে শুধু তাঁর চেহারারই মিল ছিল না, চারিত্রিক দিক দিয়েও অনেক মিল ছিল। কারণ তিনি ছিলেন উদারহস্ত, ভদ্র, খোদাভীরু, ধর্মপরায়ণ, সমীহ আদায়কারী, দূরদর্শী, ইসলামী ফিকাহ সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং সুবক্তা। তাঁর বক্তব্যে তিনি সহজেই মানুষের মন আকৃষ্ট করতে পারতেন।

তাঁর বদান্যতা ও দয়া

তাঁর দানশীলতা ছিল প্রবাদতুল্য। যার মধ্যে দানশীলতা থাকে তাঁর মধ্যে অন্যান্য মানবিক গুণেরও সমাবেশ ঘটে। আর যার মধ্যে কৃপণতা থাকে

---

[১] আল-আসকলানী, *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, খ. ২, পৃ. ৬৫, ক্র. ১৭২৪

তার মধ্যে যাবতীয় দোষ ও হীনতা জায়গা করে নেয়। হযরত হাসান (রাযি.) বদান্যতা ও দয়ার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি একজন মাত্র সওয়ালকারীকেই এক লক্ষ দিরহাম পর্যন্ত দান করতেন।

হযরত আবু ইসহাক ইবনে মুদারিব হযরত আলী (রাযি.)-এর বরাত দিয়ে বলেন, তিনি একবার লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার এক পর্যায়ে বললেন, আপনাদের ভাইয়ের পুত্র হাসান ইবনে আলী কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছে এবং সে তা আমাদের মধ্যে বণ্টন করতে চাই। লোকজন জড়ো হলে হযরত হাসান (রাযি.) বললেন, আমি শুধু গরীবদের মধ্যে বিতরণের জন্য এই অর্থ সংগ্রহ করেছি। এতে অর্ধেক সংখ্যক মানুষ দাঁড়াল। প্রথম যে ব্যক্তি এ দান গ্রহণ করেন তিনি হলেন আল-আসাত ইবনে কায়েস।

তিনি বলতেন,

لَقَضَاءُ حَاجَةِ أَخٍ لِيْ فِي اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنِ اعْتِكَافِ شَهْرٍ.

‘মসজিদে একমাস ই’তিকাফ করার চাইতে আমার একজন ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করতে পারা আমার কাছে অধিক প্রিয়।’[১]

وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ: سَمِعَ الْحَسَنَ رَجُلًا إِلَىٰ جَانِبِهِ يَدْعُو اللهُ أَنْ يُمَلِّكَهُ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَقَامَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ.

‘হযরত সায়ীদ ইবনে আবদুল আযীয বলেন, হযরত হাসান (রাযি.) একদিন দেখলেন, তাঁর পাশে এক ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ১০ হাজার দিরহাম অর্থের জন্য দুআ করছে। তা শুনে তিনি বাড়ির অভ্যন্তরে গেলেন এবং লোকটির জন্য সমপরিমাণ অর্থ পাঠিয়ে দিলেন।’[২]

তাঁর ধার্মিকতা

তিনি ছিলেন খুবই খোদাভীরু ও ধর্মপরায়ণ। সবসময় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে তিনি সচেষ্ট থাকতেন। প্রতি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে তিনি সুরা আল-কাহাফ (পবিত্র কুরআনের ১৮ সূরা) তিলাওয়াত করতেন। ছোট পাথরের ফলকে লেখা সূরাটি তিনি সবসময় সাথে রাখতেন এবং বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়তেন।[৩]

---

[১] ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ৮, পৃ. ৪২
[২] ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ৮, পৃ. ৪২
[৩] ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ৮, পৃ. ২১

তিনি পায়ে হেটে ২৫ বার হজ্জ পালন করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আমার কোন কাজের জন্যই আমি আফসোস করি না, শুধু আমার যৌবনকালে পদব্রজে হজ্জ করতে না পারার আপসোস ছাড়া। অথচ হযরত হাসান (রাযি.) ২৫ বার হজ্জ করেছেন শুধু পায়ে হেটেই।[১]

ভদ্রতা

তাঁর ভদ্রতা ও বিনয় এতই উচ্চপর্যায়ের ছিল যে, যে কারো অসদাচরণে তিনি অবিচলিত থাকতেন।

وَقَالَ جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ: لَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بَكَىٰ عَلَيْهِ مَرْوَانُ فِيْ جِنَازَتِهِ، فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ: أَتَبْكِيْهِ وَقَدْ كُنْتُ تُجَرِّعُهُ مَا تُجَرِّعُهُ؟ فَقَالَ: إِنِّيْ كُنْتُ أَفْعَلُ إِلَىٰ أَحْلَمُ مِنْ هَذَا، وَأَشَارَ هُوَ إِلَى الْجَبَلِ.

'হযরত জুওয়ারিয়া ইবনে আসমা বর্ণনা করেন, হযরত হাসান (রাযি.)-এর ইন্তিকালের পর মারওয়ান (মদীনার গভর্নর) খুবই কাঁদছিলেন। হযরত হুসাইন (রাযি.) তাঁকে বললেন, তাঁর জন্য সর্বপ্রকার সমস্যা সৃষ্টি করার পর তুমি এখন কাঁদছ? তিনি বললেন, আমি এমন একজনের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করেছি যার সহ্য ক্ষমতা ছিল তারও চেয়ে অধিক। এ বলে সে পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করল।'[২]

মারওয়ান হযরত হাসান (রাযি.)-এর সাথে খুবই খারাপ আচরণ করতেন কিন্তু তিনি সবসময় তাঁর সাথে সদাচরণ করতেন। তাঁর ধৈর্য ছিল পাহাড়ের মতো অটল। মারওয়ানের মূর্খতাকে তিনি এড়িয়ে চলতেন। অন্য যে কারো মূর্খসুলভ আচরণে তিনি অধৈর্য হতেন না। কেউ কেউ বলত, কাপুরুষতার কারণে তিনি হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)-কে খিলাফত ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি উত্তম বিষয় ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতেন

عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ كُلَّ لَيْلَةٍ سُوْرَةُ الْكَهْفِ فِيْ لَوْحٍ مَكْتُوْبٍ يَدُوْرُ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ مِنْ بُيُوْتِ أَزْوَاجِهِ قَبْلَ أَنْ يَّنَامَ وَهُوَ فِي الْفِرَاشِ ﷺ.

[১] ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ৮, পৃ. ৪২

[২] ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ৮, পৃ. ৪৩

না। তিনি মন্দের প্রতিদান দিতেন উত্তম আচরণের দ্বারা। এর চেয়ে উত্তম বিনয় ও স্বার্থত্যাগ আর কী হতে পারে যে, তিনি মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাত এড়ানোর জন্য খিলাফতের দাবি হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)-এর কাছে ছেড়ে দিয়েছেন। যে খিলাফতের তিনিই ছিলেন অধিক হকদার। তিনি বলতেন, আমি রক্তের প্রবাহ সৃষ্টি করে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতদের ওপর কর্তৃত্ব করতে চাই না।

সাহসিকতা

কোন প্রকার ভীতি কিংবা কাপুরুষতার কারণে তিনি যুদ্ধ পরিহার করেননি। তাঁর প্রতি কাপুরুষতার অপবাদ দেওয়া, আল্লাহ মাফ করুন, গোস্তাখি (অন্যায় ও অবিচার)। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি মুসলমানদের মধ্যে অহেতুক রক্তারক্তি হবে সে কারণেই তিনি যুদ্ধ পরিহার করেছেন। অযথা রক্তপাতের জন্য তিনি আল্লাহর কাছে দায়ী হবেন এ ভয়ে তাঁকে এ কাজ হতে বিরত রেখেছে। কিন্তু যুদ্ধ যেখানে অনিবার্য ছিল সেখানে তিনি পূর্ণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং প্রাণপণ লড়াই করেছেন। বিদ্রোহের দিনে হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযি.)-কে যারা সমর্থন করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি খারেজিদের মধ্যে বিরুদ্ধে তাঁর মহান পিতার পাশাপাশি যুদ্ধ করেছেন। এ ছাড়া ও তিনি অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যে সাহসের প্রয়োজন ছিল তার চেয়ে দ্বিগুণ সাহসের প্রয়োজন ছিল যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য। অনেক বীর সাহসী বলে যুদ্ধ করে না, যুদ্ধ করে পার্থিব স্বার্থে, ধন-সম্পদ অর্জনের লোভে। অথবা তাদের প্রবৃত্তির তাড়নায়, খ্যাতি অর্জনের মোহে। পার্থিব লোভ-লালসা ও খ্যাতির মোহ তাদেরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে যে, আপন লোকদের বন্যায় দেশ ভেসে গেলেও তারা পিছ পা হয় না।

আল্লাহভীতি

হযরত হাসান (রাযি.) ছিলেন অতি-উঁচু স্তরের ধার্মিক। আল্লাহ তাঁকে যে সবসময় দেখছেন একথা তিনি কখনো ভুলতেন না। আল্লাহর রোষের ভয়ে তার দীল সবসময় কাঁপত। কাঁপবেই না বা কেন, তিনি তো ছিলেন নবীজির পাঠশালা হতে সবক ও সনদ গ্রহণকারী ছাত্র। শৈশব থেকেই নবীজি (সা.)-এর সরাসরি ফয়েযপ্রাপ্ত হয়ে তিনি আল্লাহপ্রেমের দীক্ষা নিয়েছেন।

عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: أَذْكُرُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّنِيْ أَخَذْتُ تَمْرَةً مِّنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلْتُهَا فِيْ فِيَّ، فَنَزَعَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِلُعَابِهَا، فَجَعَلَهَا فِي التَّمْرِ، فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ التَّمْرَةِ لِهَذَا الصَّبِيِّ؟ فَقَالَ: «إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ».

'হযরত আবুল হাওরা (রহ.) একবার হযরত হাসান (রাযি.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলে করীম (সা.)-এর কোন স্মৃতিটি আপনার বেশি মনে পড়ে? তিনি বললেন, আমার মনে পড়ে সদকার জন্য রক্ষিত খেজুরের মধ্য হতে আমি একদিন একটা খেজুর নিয়ে মুখে দিয়েছিলাম, থুথু মিশ্রিত সে খেজুর তিনি আমার মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে অন্যান্য খেজুরের সাথে রেখে দিলেন। বলা হল, 'হে আলাহর রাসূল (সা.)! এ খেজুরে আপনার আপত্তি কিসের? তিনি জবাবে বললেন, 'আমরা মুহাম্মদের পরিবারের সদস্য, আমাদের জন্য সদকার বস্তু গ্রহণ নিষিদ্ধ।' তিনি আরও বলেন, 'সন্দেহজনক বস্তু পরিহার করবে, যা তোমার মনে সন্দেহের উদ্রেক করে না তা গ্রহণ করবে। কেননা সত্য মনে সন্তোষ আনে আর মিথ্যা মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে।''[১]

হযরত হাসান (রাযি.) একদিন আলাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা সহকারে ক্রন্দনরত অবস্থায় প্রার্থনা করছিলেন। তা দেখে এক ব্যক্তি বলল, আপনি আলাহর শাস্তিকে ভয় পাচ্ছেন অথচ আপনার মুক্তির উপায় হাতের কাছেই? আপনি মহানবী (সা.)-এর পরিবারের সদস্য, আপনি সুপারিশ লাভের যোগ্য, আল্লাহর রহমতের হকদার, যে রহমত সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে। হযরত হাসান (রাযি.) উত্তর দিলেন, আপনি মহানবী (সা.)-এর পরিবারের সদস্য হওয়ার কথা বলছেন, অথচ আল্লাহ রাববুল আলামীন কি বলেছেন শুনেন, আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَآ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ ۝١٠١

'আর যেদিন শিঙ্গায় ফুক দেওয়া হবে, সেদিন আত্মীয়তার কোন বন্ধন থাকবে না কেউ কারো কোন খোঁজ নেবে না।'[২]

---

[১] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ৩, পৃ. ৭৩, হাদীস: ২৭১০

[২] আল-কুরআন, *আল-মু'মিনূন*, ২৩:১০১

আর সুপারিশ সম্পর্কে মহামহিম আল্লাহ কি বলেছেন শুনুন,

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾

'আল্লাহ তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, অনাদি। তাকে তন্দ্রা বা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর। কে আছে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের (মানুষের) সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত আছেন। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তার জ্ঞানের কোন কিছুই তারা আয়ত্ব করতে অক্ষম। তাঁর আসন আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত আর তাদের রক্ষণাবেক্ষণে তিনি ক্লান্ত হন না। তিনি অতিউচ্চ, বিরাট।'[১]

আর আল্লাহর যে রহমত সবকিছুকে ঘিরে আছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ؕ قَالَ عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ؕ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٥٦﴾

'এবং আমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নির্ধারিত কর, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করছি। আল্লাহ বললেন, আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি আর আমার দয়া, তা তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত। সুতরাং আমি তা তাদের জন্য বরাদ্দ করি যারা মুত্তাকী, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে।'[২]

অর্জিত সম্মান

হযরত হাসান (রাযি.)-কে সবাই খুবই সম্মান করতেন। তিনি ছিলেন নবী করীম (সা.)-এর প্রতিচ্ছবি। যখনই কারো সাথে তাঁর দেখা হত

---

[১] আল-কুরআন, *আল-বাকারা*, ২:২৫৫

[২] আল-কুরআন, *আল-আ'রাফ*, ৭:১৫৬

তিনিই তাঁর সামনে বিনয়াবনত হয়ে পড়তেন। তাঁর মর্যাদার সামনে তারা নিজেদেরকে ছোট মনে করতেন।

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهَا أَتَتْ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ شَكْوَاهُ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَذَانِ ابْنَاكَ فَوَرِّثْهُمَا شَيْئًا، فَقَالَ: «أَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ هَيْبَتِيْ وَسُؤْدُدِيْ، وَأَمَّا حُسَيْنٌ فَلَهُ جُرْأَتِيْ وَجُودِيْ».

'একবার হযরত ফাতিমা (রাযি.) তাঁর দু'ছেলে হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রাযি.)-কে নবীজীর দরবারে উপস্থিত হলেন। তখন নবী করীম (সা.) অন্তিম রোগশয্যায় শায়িত। তিনি তাঁদের কিছু জিনিস দিলেন। তারপর বললেন, 'হাসানের রয়েছে আমার মতো সম্মান ও কর্তৃত্ব আর হুসাইনের রয়েছে আমার মতো সাহস ও বদান্যতা।''[১]

হযরত মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাযি.) ক্ষমতার শীর্ষদেশে অবস্থান করা সত্ত্বেও হযরত হাসান (রাযি.)-কে ভয় পেতেন। তাঁকে সম্মান করতেন। হযরত হাসান (রাযি.) এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন, তিনি কারও সমালোচনাকে গ্রাহ্য করতেন না।

عَنْ رُزَيْقِ بنِ سَوَّارٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ الْحَسَنِ وَمَرْوَانَ كَلاَمٌ، فَأَغْلَظَ مَرْوَانُ لَهُ، وَحَسَنٌ سَاكِتٌ، فَامْتَخَطَ مَرْوَانُ بِيَمِيْنِهِ. فَقَالَ الْحَسَنُ: وَيْحَكَ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْيَمِيْنَ لِلْوَجْهِ، وَالشِّمَالَ لِلْفَرْجِ؟ أُفٍّ لَكَ! فَسَكَتَ مَرْوَانُ.

'রুযাইক ইবনে সাওয়ারের বর্ণনা মতে, একদিন হযরত হাসান (রাযি.) ও মারওয়ানের মধ্যে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। মারওয়ান খুব কটূ কথা বলছিল। হযরত হাসান (রহ.) নীরব রইলেন। একপর্যায়ে মারওয়ান ডান হাত দিয়ে নাক ঝাড়ল। তখন হাসান (রাযি.) বললেন, দুর্ভোগ তোমার জন্য। তুমি কি জান না? ডান হাত মুখমণ্ডলেনর জন্য, আর বাম হাত শরীরের ছিদ্রপথগুলোর জন্য। ধিক তোমাকে এ কথা শুনে মারওয়ান চুপ হয়ে গেল।'[২]

---

[১] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ২২, পৃ. ৪২৩, হাদীস: ১০৪১

[২] আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৩, পৃ. ২৬৬

এ ঘটনা হতে আমরা এ মহান ব্যক্তিত্বের চারিত্রিক বৈশিষ্ট সম্পর্কে জানতে পারি। নিজে কটূ বাক্যের শিকার হয়েও তিনি চুপচাপ ছিলেন। কিন্তু ইসলামি আদব কায়দা রক্ষার প্রশ্ন যখন আসল তখন তিনি মারওয়ানে ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সত্ত্বেও তিনি তিরস্কার করতে দ্বিধা করেননি। তাঁর কথার ওপর মারওয়ানের জবাব দেওয়ার কিছু ছিল না।

জ্ঞান

হযরত হাসান (রাযি.) ছিলেন খুবই জ্ঞানী। তার জ্ঞানের পরিধি ছিল বিস্তৃত। হযরত রাসূলে করীম (সা.) যখন দুনিয়া ত্যাগ করেন তখন হযরত হাসান (রাযি.) ছিলেন বালক মাত্র। তা সত্ত্বেও তিনি কতিপয় হাদীস শিখে নিয়েছিলেন এবং সেসব বর্ণনা করেছেন। আমরা সে হাদীসটির কথা স্মরণ করতে পারি যেখানে তিনি বর্ণনা করেছেন, হুযুর করীম (সা.) তাঁর মুখ থেকে সদকার জন্য রক্ষিত খেজুরটি সরিয়ে নিয়ে বলেছিলেন, 'আমরা মুহাম্মদের পরিবারের সদস্য, আমাদের জন্য সদকার বস্তু হারাম।'[১]

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُولَ فِي الْوِتْرِ:
«اللَّهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ،
وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ؛ إِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ،
إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ».

তিনি বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাকে কিছু শব্দ শিক্ষা দিয়েছেন যা আমি কুনুতে পাঠ করে থাকি (কুনুত: নামাযের মধ্যে প্রার্থনাবাক্য): 'হে আল্লাহ আপনি যাদেরকে হিদায়ত করেছেন তাদের সাথে আমাকেও হিদায়ত করুন...।''[২]

হুযুর করীম (সা.)-এর ইন্তিকালের পরেও তিনি জ্ঞান অর্জন বিমুখ ছিলেন না। তাঁর পিতা আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.) ছিলেন একাধারে মহাজ্ঞানী, হাদীস বিশারদ, অদ্বিতীয় বক্তা, আধুনিক যুগের মানুষের রয়েছে যার শিক্ষার ব্যাপক প্রভাব। আর তিনি ছিলেন সে সুযোগ্য পিতার সন্তান। হযরত হাসান (রাযি.) মানুষের মাঝে তাঁর জ্ঞানের প্রভাব ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সবসময় উৎসাহী ছিলেন।

---

[১] আত-তাবারানী, ***আল-মু'জামুল কবীর***, খ. ৩, পৃ. ৭৩, হাদীস: ২৭১০

[২] আত-তাবারানী, ***আল-মু'জামুল কবীর***, খ. ৩, পৃ. ৭৩, হাদীস: ২৭০১

যে কথায় তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রমাণ মেলে

নিম্নোক্ত হাদীসটিতে হযরত হাসান (রাযি.)-এর ব্যক্তিত্বেও প্রমাণ মেলে। এতে আরও বোঝা যায় কিসে তাঁর অনুরাগ, কিসে বিরাগ। মনে হবে তিনি যেন নিজের সম্পর্কেই বলছেন। একদিন তিনি তাঁর সাথীদের বললেন, আমি আমার এক ভাই সম্পর্কে আপনাদের বলব, আমার দৃষ্টিতে যার স্থান খুবই ঊর্ধ্বে। আমার দৃষ্টিতে তাঁর চরিত্রের উজ্জ্বল দিক হচ্ছে, পার্থিব সম্পদের প্রতি অনীহা। সে প্রবৃত্তির তাড়নায় পরিচালিত হয় না, তাঁর যা নেই তার প্রতি লোভ করে না। যা আছে তার থেকে বেশি কিছু গ্রহণ করে না। সে অজ্ঞানতার দ্বারা পরিচালিত হয় না। সে যখন নিশ্চিত থাকে যে, কোন বিষয়ে একজন মানুষ উপকৃত হবে তখনই শুধু তার পানে হাত বাড়ায়। সে মানুষের মঙ্গল ব্যতীত এক পদও সামনে অগ্রসর হয় না। সে কখনো রাগ করে না। বিরক্ত হয় না। যখন কোথাও জ্ঞানী লোকদের সমাবেশ হয় তখন সে কথা বলার চাইতে চুপ থাকতেই বেশি পছন্দ করে। বেশির ভাগ সময়ই সে নিশ্চুপ থাকে। কিন্তু যখন কথা বলে তখন সে হয়ে পড়ে সর্বোত্তম বক্তা। সে তার ভাইদের ব্যাপারে উদাসীন নয়। সে তাদের সাথে মতামত বিনময় ছাড়া কিছুই নিজের মনে গোপন করে রাখে না।

বাকপটুতা

সিরাত গ্রন্থসমূহে তার বাক-কুশলতা, ভাষাজ্ঞান ও গভীর চিন্তা-ভাবনা সমম্পর্কে অনেক বিবরণ রয়েছে। একবার তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, গনীমত কি? তিনি বললেন, খোদাভীতি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা এবং পার্থিব জীবনের প্রতি নির্মোহ মনোভাব পোষণ। সেটাই সহজ গনীমত। আরেকবার তার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, আল-হিলম (ধৈর্য) কী? তিনি জবাব দিলেন, নিজের রাগ দমণ ও আত্মসংবরণ করা। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আস-সাফা ফাহিসা অশীলতা কী? তিনি বললেন নিকৃষ্ট বস্তু ও হীনতার অনুসরণ এবং সীমা লঙ্গণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন। একবার বলা হল গফলত (অলসতা) কী? তিনি জবাব দিলেন, মসজিদকে পরিত্যাগ করা ও দুর্নীতিবাজদের তাবেদারী করা। জিজ্ঞেস করা হল আস-সুহহ (কৃপণতা) কী? তিনি জবাব দিলেন, নিজের হাতে যা আছে তাকে আর্শীবাদ মনে করা এবং যা খরচ করা হয় তা নষ্ট হয়ে গেছে মনে করা।[১]

---

[১] আল-মিয্যী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ৬, পৃ. ২৩৮–২৩৯, ক্র. ১২৪৮

তিনি বললেন, যার সৎ মনোভাব নেই, তার ভালো চরিত্র নেই। যার মন উদার নয় তার জন্য ভালোবাসা নেই। যার ধর্ম নেই তার হায়াও নেই। সৎ মনোভাবের সর্বোত্তম পরিচয় হচ্ছে মানুষের সাথে সদ্ভাব রাখা। সৎ মনোভাবের মাধ্যমে মানুষ ইহকাল পরকাল উভয়ই অর্জন করতে পারে।

তিনি আরও বলতেন, আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক, তাহলে সত্যিকারের ইবাদতকারী হতে পারবে। আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাক, তাহলে ধনী হতে পারবে। প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ কর, তাহলে উত্তম মুসলমান হতে পারবে। মানুষের সাথে সেই ব্যবহার কর, যে ব্যবহার তুমি নিজে তাদের কাছ হতে আশা কর, তাহলেই ন্যায়পরায়ণ হতে পারবে।

তিনি বলতেন, তিনটি বিষয়ের মধ্যে মানুষের ধ্বংস নিহিত, অহংকার লালসা ও ঈর্ষা। অহংকার দীনকে ধ্বংস করে দেয়, এ অহংকারের ফলেই ইবলিশ অভিশপ্ত হয়েছে। লালসা আত্মার শত্রু, এর ফলে হযরত আদম (আ.)-কে বেহেশত হতে বের হয়ে যেতে হয়েছে। ঈর্ষা মানুষকে কুকর্মে প্ররোচনা দেয়, এর ফলে কাবিল হাবিলকে হত্যা করেছে।

বক্তব্যে শালীনতা

কথাবার্তায় সবসময় তিনি শালীনতা বজায় রেখে চলতেন। কখনো অশ্লীল কোন বাক্য তিনি উচ্চারণ করেননি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আওয়ান (রহ.) হযরত ওমর ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন, হযরত হাসান ইবনে আলী (রাযি.)-এর নীরবতার চেয়ে কথাই ছিল আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়, অন্য কারো কথার চাইতে। আমি তাঁর কাছ থেকে কখনো কোন খারাপ কথা শুনিনি, শুধু একবার ছাড়া। তা হচ্ছে, তিনি ও আমর ইবনে উসমান এর মধ্যে একখণ্ড জমি নিয়ে বাদানুবাদ হচ্ছিল। তিনি কিছু একটা কিছু বলছিলেন আর আমর তা মানছিলেন না। হযরত হাসান (রাযি.) তখন বললেন, আমাদের সবকিছুই তার কাছে অপছন্দ। আমার জানা মতে এটাই ছিল তাঁর মুখ থেকে বের হওয়া একমাত্র শক্ত কথা।

ইন্তিকাল

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: رَأَى الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فِيْ مَنَامِهِ أَنَّهُ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ ﴾ [الإخلاص] فَفَرِحَ بِذَلِكَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعِيدَ بْنَ

الْـمُسَيَّبِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ رَأَىٰ هَذِهِ الرُّؤْيَا، فَقَلَّ مَا بَقِيَ مِنْ أَجْلِهِ. قَالَ: فَلَـمْ يَلْبَثِ الْـحَسَنُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا أَيَّامًا حَتَّىٰ مَاتَ.

'হযরত ইমরান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে তালহার বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি একবার হযরত হাসান (রাযি.)-কে স্বপ্নে দেখলেন। তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখা রয়েছে, বল তিনি হচ্ছেন আল্লাহ, যিনি একক। এটা দেখে তিনি খুব খুশি হলেন এবং হযরত সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব (রাযি.)-কে তা জানালেন। শুনে তিনি বললেন, এ বক্তব্য যদি সঠিক হয়ে থাকে তাঁর হায়াত বেশি দিন বাকি নেই। এরপর হযরত হাসান (রাযি.) খুব বেশি দিন জীবিত ছিলেন না। অচিরেই তিনি ইন্তিকাল করেন।'[১]

হযরত হাসান (রাযি.)-কে যখন বিষ প্রয়োগ করা হয় তখন তিনি বললেন, বহুবার আমাকে বিষ পান করতে হয়েছে কিন্তু এবারের মতো মারাত্মক বিষ আমি আর কোনদিন পান করিনি। এ দফার বিষ প্রয়োগ এমন মারাত্মক হয়েছিল যে, চিকিৎসক বললেন, বিষ উনার নাড়িভূড়ি ছিঁড়ে ফেলেছে। বিষ তাঁর পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়লে তাঁর ভাই হযরত হুসাইন (রাযি.) এসে শিয়রে বসে জানতে চাইলেন, 'হে আমার ভাই! কে এ কাজ করেছে? তিনি বললেন, তুমি কি তাকে হত্যা করতে চাও? হযরত হুসাইন (রাযি.) বললেন, হ্যাঁ, চাই। এবার হাসান (রাযি.) বললেন, যাকে আমি আমার হত্যাকারী বলে মনে করি, সে যদি আসলেই হত্যাকারী হয় তাহলে সে আল্লাহর তরফ হতে অবশ্যিই অধিকতর শাস্তির যোগ্য হবে, আর যদি সে আমার হত্যাকারী না হয়ে থাকে তাহলে আমি চাই না তুমি কোন এক নিরপরাধ লোককে হত্যা কর।[২]

তিনি আরও বললেন, এ জীবন পালিয়ে যাওয়া রাতের চেয়ে বেশি কিছু নয়। অতএব আমরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ না করা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। শেষ পর্যন্ত তিনি হত্যাকারীর নাম বলতে অস্বীকার করলেন। যখন তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে এল তিনি বললেন, আমার বিছানা ঘরের উঠোনে নিয়ে চল, যাতে উন্মুক্ত আকাশের রাজ্য দেখতে পাই। এতে লোকজন তাঁকে বাইরে নিয়ে গেল। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, ইয়া আলাহ! আমি বিশ্বাস করি যে, অতি শিগ্‌গিরই আমার আত্মা তোমার সাথে মিলিত হবে। এ মিলনই

---

[১] আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৮, পৃ. ৪৬
[২] আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৮, পৃ. ৪৭

আমার আত্মার পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আর আলাহ্ তাঁর জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন তার একটা অংশ হচ্ছে, (তিনি বিশ্বাস করতেন) তিনি আল্লাহর সাথে মিলিত হবেন।

তাঁর মৃত্যু যখন একদম ঘনিয়ে আসল তিনি হযরত আয়িশা (রাযি.) হতে অনুমতি নিলেন যাতে শ্রদ্ধেয় প্রিয়তম নানাজানের পাশে যেন তার দাফন হয়। হযরত আয়িশা (রাযি.) এতে রাজি হন। কিন্তু মারওয়ান এবং বনী উমাইয়ার কিছু লোক এতে বিরোধিতা করল। হযরত হুসাইন (রাযি.) তরবারির মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে চাইলেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, এ নিয়ে হযরত হাসান (রাযি.) রক্তপাত করতে নিষেধ করে গেছেন। এতে হযরত হুসাইন (রাযি.) তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। হযরত হাসান (রাযি.)-কে অতঃপর জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।[১]

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর। তখন হিজরী ৪৯ সন। মহান আল্লাহর অবারিত রহমত নাযিল হোক তাঁর ওপর।

কতিপয় শোকগাঁথা (আল-মাসউদী কর্তৃক আল-মুরূজে বর্ণিত)

হযরত হাসান ইবনে আলী (রাযি.)-এর শাহাদাতের পর তাঁর ভাই হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাযি.) বললেন, মহান আলাহ্ আপনার ওপর রহমত করুন, হে আবু মুহাম্মদ! আপনার জীবন ছিল মহৎ, মৃত্যু সে জীবনের অবসান ঘটিয়েছে। আপনার দেহের ভেতর আশ্রিত আত্মা ছিল কতই না মর্যাদাশীল! চাদরে ঢাকা আপনার দেহ কতই না চমৎকার! এর অন্যথা কীভাবে হতে পারে? যেখানে আপনি দিশারীর উত্তরাধিকারী, খোদাভীরুদের বন্দু, চাদরের সাথীদের মধ্যে পঞ্চম। [এর অর্থ হচ্ছে হুযুর (সা.) একদিন পরিবারের ৫ জন সদস্যকে চাদর দিয়ে জড়িয়ে বলেছিলেন, এরা হচ্ছে আমার আহলে বায়ত। তাঁরা হলেন হযরত মা ফাতিমা (রাযি.), হযরত আলী (রাযি.), হযরত হাসান (রাযি.), হযরত হুসাইন (রাযি.) এবং হুযুর (সা.) স্বয়ং।]

যে হাত আপনার মুখে খাবার তুলে দিয়েছিল তা ছিল সত্যের হাত [অর্থাৎ হুযুর (সা.)-এর হাত মুবারক), আপনি বেড়ে উঠেছেন ইসলামের গৃহে। বিশ্বাসের বুক থেকে করেছেন দুগ্ধ পান। আপনি যাপন করেছেন মহৎ

---

[১] আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৮, পৃ. ৪৮

জীবন, বরণ করেছেন আদর্শ মৃত্যু। যদিও আপনার সাথে বিচ্ছেদে আমাদের হৃদয়গুলো ভেঙে চৌচির হয়ে যাচ্ছে তথাপি আমরা নিশ্চিত জানি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে উত্তম পুরস্কার। আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বলেন, হে লোক সকল! আল্লাহর নবীর প্রিয়তম নাতি আজ মৃত্যুবরণ করেছেন।

হযরত হুসাইন (রাযি.) বলেন, হে আবু মুহাম্মদ! আপনার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। সত্যই আপনি সত্যের ওপর অটল ছিলেন, মিথ্যার বিরুদ্ধে আল্লাহর দীনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আপনার ধর্মানুরাগ ও উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। পার্থিব জীবনের মহত্তর বিষয়গুলোকে আপনি উপলব্ধি করেছেন নিরাসক্ত চোখে, পবিত্র হাতে অজস্র দানে ভরে দিয়েছেন জমিন। আপনি শত্রুদের সকল উদ্দেশ্যকে প্রতিহত করেছেন। আপনি আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর বংশধর। বিজ্ঞতার দুগ্ধরসে আপনি পরিপুষ্ট হয়েছেন। আল্লাহর সৃষ্ট চিরশান্তির মোকামের দিকে আপনার অভিযাত্রা। আল্লাহ আপনার এবং আমাদের পুরস্কার বাড়িয়ে দিন। তিনি আমাদেরকে ও আপনাকে শান্তি দান করুন এবং আমাদের সকল দুঃখকে মোচন করে দিন।

এভাবে আল্লাহর হাবীব হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর অতি পিয়ারা নাতি, খোদাভীরু, দানশীল, ধর্মপ্রাণ ও বিনয়ী হযরত হসান (রাযি.) পৃথিবী ত্যাগ করেন।

আল্লাহর সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র বাণীর অনুসরণে পৃথিবীর প্রতিটি মুসলমান নর-নারী হযরত হাসান (রাযি.)-এর প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা পোষণ করে চলেন। কারণ তিনি বলেছিলেন,

«دَعُوْهُمَا، بِأَبِيْ هُمَا وَأُمِّيْ مَنْ أَحَبَّنِيْ، فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ».

> ‘যারা আমাকে ভালোবাসে তারা যেন তাদের দু’জনকে ভালোবাসে (অর্থাৎ হযরত হাসান (রাযি.) ও হযরত হুসাইন (রাযি.)-কে।’[১]

উপসংহার

হযরত হাসান (রাযি.) খুবই উন্নত ও অমায়িক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ইসলামের দাবি ও প্রত্যাশাও তাই। ইসলাম চায় প্রত্যেক মুসলমান যেন এমন মহান চরিত্রের অধিকারী হয়। এই বইতে আমরা হযরত হসান

---

[১] ইবনে হিব্বান, *আস-সহীহ*, খ. ১৫, পৃ. ৪২৬, হাদীস: ৬৯৭০

(রাযি.)-এর কিছু মহৎ গুণাবলি সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আমরাও চেষ্টা করলে এমন চরিত্রের অধিকারী হতে পারি। অন্তত আমাদের উচিত এমন চরিত্রের অধিকারী হওয়ার জন্য চেষ্টা করা।

হযরত হসান ইবনে আলী (রাযি.) অতি প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। সত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল তুলনাহীন। তাঁর সাহস ও দৃঢ় সংকলপের কথা সর্বজনবিদিত। দয়া ও দানশীলতার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর বিনয় ছিল আশ্চর্যজনক। কেউ তাঁর প্রতি ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় কোন অন্যায় আচরণ করলেও তিনি রুষ্ট হতেন না। কল্যাণকর কাজের প্রতিই তিনি সাড়া দিতেন। মন্দের প্রতিদান দিতেন উত্তম ব্যবহারের দ্বারা। শুধুমাত্র মুসলমানদের মধ্যে হানাহানি এড়ানোর জন্য তিনি খিলাফতের দাবি ছেড়ে দিয়েছিলেন। এর চেয়ে বিনয় ও আত্মত্যাগের আর উজ্জল উদাহরণ কি হতে পারে? অথচ এ খিলাফতের হক ছিল তাঁর ষোল আনা।

তাঁর চরিত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য দিক ছিল পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি তাঁর নির্লোভ মনোভাব। তিনি ছিলেন খুবই ধর্মপরায়ণ। তাঁর খোদাভীতি ছিল প্রবল। আল্লাহকে হাজির নাজির জানতেন তিনি। সকল সৃষ্টির কার্যলাপ আল্লাহ সার্বক্ষনিকভাবে প্রত্যক্ষ করেন একথা কখনো ভুলেননি, তাই তিনি কখনো রাগান্বিত হতেন না। কারো মন্দ আচরণেও বিরক্তি বোধ করতেন না। তিনি ছিলেন মহাজ্ঞানী। ইসলামি ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান ছিল প্রখর। তিনি ছিলেন সুবক্তা। তাঁর বক্তব্য শুনে শ্রোতাদের মন গলে যেত। প্রায় সময়ই নিশ্চুপ থাকতে ভালোবাসতেন তিনি। কিন্তু যখন কথা বলতেন তখন মনে হত তাঁর চেয়ে উত্তম বক্তা বুঝি আর কেউ নেই।

হযরত ইমাম হুসাইন ইবনে আলী (রাযি.)

এ অনন্য ব্যক্তিত্ব যিনি দীর্ঘদিন ধরে ইতিহাস ঐতিহাসিকদের চিন্তা-চেতনাকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে আসছেন। ভবিষ্যতে এ আলোড়ন অব্যাহত থাকবে। তিনি এমন এক মহান চরিত্র যিনি ইসলামের ইতিহাসকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে আছেন। যখনই তাঁর কথা আলোচনা করা হয় তখনই বিশ্বাসী মুসলমান নর-নারীর অন্তর তাঁর প্রতি গভীর ভালোবাসা ও অসীম শ্রদ্ধায় ভরে যায়। তিনি হচ্ছেন আল্লাহর হাবীব হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর দৌহিত্র মা ফাতিমা (রাযি.)-এর দ্বিতীয় পুত্র রায়হানা (অতীব প্রিয়) বেহেস্তে যুবকদের সরদার, হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাযি.) ইবনে আবু তালিব ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাসিম ইবনে আবদ মুনাফ আল-কুরাইশী আল-হাশিমী।

মুমিনদের চোখে তিনি এমন এক কিংবদন্তীতুল্য বীরপুরুষ যিনি দীন ও আদর্শের জন্য আপন জীবনকে কুরবানী করে দিয়েছেন। তিনি ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ত্যাগের উজ্জ্বল প্রতীক। তিনি সেই বহুল প্রচলিত প্রবাদবাক্যের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি যাতে বলা হয়েছে, 'মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর তাহলে জীবনকে ফিরে পাবে।' তিনি মহান শহীদী মৃত্যু কামনা করেছিলেন আর হয়েছিলেন অনন্ত জীবনের অধিকারী। মানুষের স্মৃতিপটে তিনি আপন মহিমায় ভাস্বর। মুসলমানদের অন্তরে তিনি চিরদিনের জন্য ঠাঁই করে নিয়েছেন। আত্মোৎসর্গের এক মহান প্রতীক তিনি।

শুভ আবির্ভাব

হযরত হাসান (রাযি.)-এর বয়স তখনও দু'বছর পূর্ণ হয়নি। আলাহর নবী রাসূলে মাকবুল (সা.)-এর নিকট খবর এল অচিরেই তাঁর দ্বিতীয় নাতি দুনিয়ায় আসছেন। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বকালকে আইয়ামে জাহেলিয়া অর্থাৎ অন্ধকারের যুগ বলা হয়। সে যুগে 'হাসান' ও 'হুসাইন' এসব নাম কারো জানা ছিল না। কোথাও চালুও ছিল না।

عَنْ عِمْرَانَ بْنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ مِنْ أَسْمَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَمْ يَكُوْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

'হযরত ইমরান ইবনে সুলাইমান (রাযি.) হতে বর্ণিত, 'হাসান' ও 'হুসাইন' নামসমূহ বেহেশতবাসীদের মধ্য হতে এসেছে, জাহেলী যুগে এসব নাম কারও জানা ছিল না।'[১]

চতুর্থ হিজরীর ৩ শা'বান মাসে (৮ জানুয়ারি ৬২৬ খ্রি.) তাঁর জন্ম। তাঁর জন্মের শুভ সংবাদে রাসূলে করীম (সা.) খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর তাহনীক (তাহনীক: একটি ইসলামী প্রথা। খেজুর ইত্যাদি জাতীয় ফল চিবিয়ে তার রস নবজাতকের প্রথম খাবাররূপে মুখে দেওয়া এবং পরে তার কানে আযান দেওয়া) করলেন ও তাঁর কানে আযান দিলেন এবং তিনিই নবজাতকের নাম হুসাইন রাখেন। হাদীস শরীফের বর্ণনায় এর প্রমাণ আছে। হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর চেহারা ছিল খুবই আকর্ষণীয় ও সুন্দর। হুযুর করীম (সা.)-এর পবিত্র চেহারা মুবারকের সাথে তাঁর চেহারার মিল ছিল। যেভাবে মিল ছিল তাঁর বড় ভাই হযরত হাসান (রাযি.)-এর চেহারা। জন্মের সাতদিনের দিন স্বয়ং রাসূলে পাক (সা.)-এর একটি মেষ (কোন কোন বর্ণনায় দুটো) যবেহ করে তাঁর (আকীকা: ইসলামী প্রথা। শিশুর জন্মের পর আল্লাহ তায়ালার প্রতি শুকরিয়া হিসেবে একটি বা দুটো মেষ অথবা এ জাতীয় পশু যবেহ করা। ছেলের জন্য দুটো ও মেয়ের জন্য একটি) দেন। এর পর তিনি হযরত হাসান (রাযি.)-এর বেলায় যেমন নির্দেশ দিয়েছিলেন তেমনি হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর মাথার চুল কামিয়ে তার ওজনের সমপরিমান রৌপ্য গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন।

দু'সহোদর

হযরত হাসান (রাযি.) ও হযরত হুসাইন (রাযি.) এ দু'সহোদরের নাম এমন ওৎপ্রোতভাবে জড়িত যে, অনেকেই ভুলক্রমে তাঁদেরকে যমজ ভাই মনে করে থাকে। অবশ্যই তাঁদের দু'ভাইয়ের মধ্যে ভালোবাসা, বন্ধুত্ব ও সমপ্রীতি এতই গভীর ছিল যে, তা অনেক যমজ ভাইয়ের মাঝেও দেখা যায় না। তাঁদের উভয়ের মধ্যে বয়েসের ব্যবধান দু'বছরেরও কম। হযরত হুসাইন (রাযি.) যখন বুকের দুধ খাচ্ছেন তখন হাসান (রাযি.)-এর ভালো করে মুখের বুলিও ফোটেনি। তাঁরা দু'জন ছিলেন একাত্ম্য। এক সাথে খেতেন তারা, এক

---

[১] ইবনুল আসীর, *উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা*, খ. ২, পৃ. ২৪, হাদীস: ৩১৯, জীবনী: ১১৭৩

সাথে খেলতেন। দু'জনের স্মৃতিও এক। কোথাও যেতে হলে এক সাথে যেতেন তাঁরা। তাদের দু'জনের মধ্যে ভালোবাসার যে গাঢ় বন্ধন তার পেছনকার রহস্য ছিল তারা দু'জনই মহান পুরুষের পিতৃস্নেহে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। পেয়েছিলেন তাঁদের উষ্ণ সানিধ্য। তাদের পারিবারিক পরিবেশও ছিল খুবই চমৎকার, উন্নত ও সদাচরণের অনুকূল। উভয়ের প্রতি উভয়ের ছিল প্রবল অনুরাগ, আচার-আচরণে ছিলেন খুবই বিনম্র ও শালীন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা উভয়ে কখনো একে অন্যের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতেন না। পবিত্র হাদীস শরীফে যেখানে হযরত হাসান (রাযি.)-এর নাম উচ্চারিত হয়েছে সেখানে অনিবার্যভাবে হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর কথাও উল্লেখিত হয়েছে। নিম্নোক্ত হাদীস শরীফেও একথার প্রমাণ মেলে। হযরত রাসূলে করীম (সা.) বলেন,

«الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

'হাসান এবং হুসাইন বেহেস্তে যুবকদের সরদার।'[১]

হযরত ওসামা ইবনে যায়দ (রাযি.) হতে বর্ণিত একটি হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, হুযুর করীম (সা.) বলেন,

«هَذَانِ ابْنَايَ وَابْنَا ابْنَتِيَ، اللَّهُمَّ إِنِّيْ أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَنْ يُّحِبُّهُمَا».

'এরা দু'জন আমার বংশ এবং আমার কন্যার সন্তান, হে আল্লাহ! আমি তাঁদেরকে ভালোবাসি, আপনিও তাঁদের ভালোবাসুন। আর তাঁদেরকেও ভালোবাসুন যারা এদের দু'জনকে ভালোবাসে।'[২]

হযরত হুযাইফা (রাযি.) বর্ণনা করেন, হুযুর (সা.) বলেছেন,

«فَإِنَّ جِبْرِيْلَ جَاءَ يُبَشِّرُنِيْ أَنَّ الْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

'হে হুযাইফা! এ মাত্র হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে আমাকে সুসংবাদ দিয়ে গেলেন, হাসান-হুসাইন হবে বেহেস্তে যুবকদের সরদার।'[৩]

হযরত হাসান (রাযি.) ও হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে এমন হাদীসের সংখ্যা অসংখ্য। হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর

---

[১] আত-তিরমিযী, ***আল-জামি'উল কবীর***, মিসর, খ. ৫, পৃ. ৬৫৬, হাদীস: ৩৭৮৬, হযরত আবু সায়ীদ আল-খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত

[২] আত-তিরমিযী, ***আল-জামি'উল কবীর***, খ. ৫, পৃ. ৬৫৭, হাদীস: ৩৭৬৯

[৩] আহমদ ইবনে হাম্বল, ***আল-মুসনদ***, খ. ৩৮, পৃ. ৩৫৫, হাদীস: ২৩৩৩০

জীবনী বর্ণনাকালে আমরা আরও কিছু হাদীসের উল্লেখ করব। বস্তুত তাঁদের উভয়কে সবসময় একই সাথে দেখা যেত। বাইরে গেলেও তাঁরা একসাথে বের হতেন। একদিন তাঁরা ঘর হতে বের হয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলেন। হারিয়ে ফেলেছিলেন পথের দিশা। মা জননী ফাতিমা (রাযি.) তাঁদের অনুপস্থিতিতে পাগলপারা হয়ে পড়লেন। ভাবলেন তাঁদের কোথাও কোন বিপদ ঘটেছে। তিনি দ্রুত আল্লাহর নবী (সা.)-এর দরবারে এসে কেঁদে কেঁদে বললেন, হাসান-হুসাইন দু'জনই বাইরে চলে গেছে। আমি জানি না তাঁরা কোথায় আছে। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি তাঁদের প্রতি তোমার চাইতেও বেশি দয়ালু ও যত্নবান।' অতঃপর তিনি মহান আল্লাহর দরবারে তাঁদের নিরাপত্তার জন্য এ বলে দুআ করলেন, 'ইয়া আলাহ! তাঁরা জলে ও স্থলে যেখানে থাকুক না কেন, তাঁদেরকে নিরাপদে ফিরিয়ে দিন ও সুরক্ষা দান করুন।'

তারপর আলাহর নবী (সা.)-এর কাছে তাঁদের সম্পর্কে খবর পৌঁছল। তাঁদের এক জায়গায় পাওয়া গেল যেখানে তাঁরা একে অন্যের বাহুতে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছেন। নবী করীম (সা.) সেখানে গিয়ে হাটু গেড়ে বসলেন এবং তাঁদেরকে চুমু খেলেন। তিনি হযরত হাসান (রাযি.)-কে ডান কাঁধে ও হযরত হুসাইন (রাযি.) বাম কাঁধে তুলে নিলেন। আর বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের প্রতি সেভাবেই দৃষ্টি রাখব যেভাবে মহান সম্মানিত ও গৌরবের অধিকারী আল্লাহ তোমাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।' পথিমধ্যে হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর সাথে নবী করীম (সা.)-এর সাক্ষাৎ হল। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজনকে আমায় দিন যাতে আপনার বোঝা হালকা হয়। কিন্তু নবী করীম (রাযি.) জবাব দিলেন, 'কি চমৎকার বাহন আর কি চমৎকার আরোহীই না তারা! আর তাঁদের পিতা তাঁদের চেয়ে উত্তম। এভাবে তিনি তাঁদেরকে মসজিদ পর্যন্ত বহন করে নিয়ে এলেন।'[১]

---

[১] (ক) আল-হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, খ. ৯, পৃ. ১৮২, হাদীস: ১৫০৮১; (খ) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ৩, পৃ. ৬৫, হাদীস: ২৬৭৭:

عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: كُنَّا حَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ لَقَدْ ضَلَّ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ. قَالَ: وَذَلِكَ رَادَّ النَّهَارِ، يَقُولُ: ارْتِفَاعَ النَّهَارِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «قُوْمُوْا فَاطْلُبُوْا ابْنَيَّ» . قَالَ: وَأَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ نُجَاءَ وَجْهِهِ، وَأَخَذْتُ نَحْوَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّىٰ أَتَىٰ سَفْحَ جَبَلٍ، وَإِذَا الْ حَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ﷺ مُلْتَزِقٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، وَإِذَا شُجَاعٌ قَائِمٌ عَلَىٰ ذَنَبِهِ، يَخْرُجُ مِنْ فِيْهِ شِبْهُ النَّارِ، فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَالْتَفَتَ مُخَاطِبًا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ انْسَابَ فَدَخَلَ بَعْضَ الْأَحْجِرَةِ، ثُمَّ أَتَاهُمَا فَأَفْرَقَ بَيْنَهُمَا وَمَسَحَ

হযরত হাসান (রাযি.) ও হযরত হুসাইন (রাযি.) দু'জনও আলাহ্‌র হাবীব নবী করীম (সা.)-কে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তিনি যেখানেই থাকতেন তাঁকে তাঁরা খুঁজে বের করতেন।

عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ، يَقُوْلُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُنَا، فَجَاءَ الْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ، فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ، فَحَمَلَهُمَا فَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «صَدَقَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ: ﴿ إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ ﴾ [التغابن] نَظَرْتُ إِلَىٰ هَذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ، فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّىٰ قَطَعْتُ حَدِيثِيْ وَرَفَعْتُهُمَا».

'হযরত বুরায়দা (রাযি.) বর্ণনা করেন, একদিন নবী করীম (সা.) খুতবা দিচ্ছিলেন। সেখানে হযরত হাসান (রাযি.) ও হুসাইন (রাযি.) উপস্থিত হলেন। তাঁদের পরনে ছিল লাল পোশাক। তাঁরা একবার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন আবার উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটছিলেন। তিনি খুতবার জায়গা থেকে নেমে এলেন এবং তাঁদেরকে সামনে নিয়ে রাখলেন এবং বললেন, 'নিশ্চই মহান আলাহ্‌ তায়ালা সত্য কথাই বলেছেন, তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা-স্বরূপ [আত-তাগাবুন ৬৪:১৫]। আমি দু'বালককে দেখার পর আর অপেক্ষা করতে পারিনি।' এরপর তিনি খুতবা দিতে শুরু করলেন।'[১]

আল্লাহর হাবীব (সা.) ছিলেন বড়ই জ্ঞানী। তিনি উভয়ের ওপর খুবই প্রভাব বিস্তার করতেন। তাঁদের উভয়ের জন্য ছিল তাঁর গভীর মমত্ববোধ। তাঁরা এমন এক প্রেমময় পরিবারে বেড়ে উঠে ছিলেন যেখানে একের প্রতি অন্যের ছিল অফুরন্ত দরদ, ভালোবাসা ও সহানুভূতি। তাই তাঁদের মাঝে এমন অনুভূতি জাগ্রত হয়েছিল যে, তাঁরা যেন দু'জনে মিলে একজন।

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُّرَحَّلٌ، مِنْ شَعْرٍ

وَجْهَهُمَا، وَقَالَ: «بِأَبِيْ وَأُمِّيْ أَنْتُمَا مَا أَكْرَمَكُمَا عَلَى اللهِ». ثُمَّ حَمَلَ أَحَدَهُمَا عَلَىٰ عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ، وَالْآخَرَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، فَقُلْتُ: طُوْبَاكُمَا، نِعْمَ الْمَطِيَّةُ مَطِيَّتُكُمَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ هُمَا، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا»

[১] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩৮, পৃ. ৯৯–১০০, হাদীস: ২২৯৯৫; (খ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২৯০, হাদীস: ১১০৯

أَسْوَدَ، فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: «﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب].

'হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বর্ণনা করেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একদিন কালো পশমের চাদর পরে বাইরে এলেন। তাতে উটের জিনের ছবি অঙ্কিত ছিল। তখন হযরত ফাতিমা (রাযি.) এলেন। তিনি তাঁকে চাদরের মধ্যে ঢুকালেন। এরপর হযরত হাসান ইবনে আলী (রাযি.) এলেন। তাঁকেও চাদরের নিচে নেওয়া হল। সবশেষে এলেন হযরত আলী (রাযি.) এলেন। তাঁকেও চাদরের নিচে ঢুকালেন। তারপর বললেন, 'হে আহলে বায়ত (নবী পরিবারের সদস্য)! আলাহ শুধু চান তোমাদের থেকে সর্বপ্রকার অমঙ্গল ও পাপ বিদূরিত করতে [আল-আহযাব ৩৩:৩৩]।''[১]

এ কারণে তাঁদেরকে চাদরের সাহাবা বলা হয়। শৈশব হতেই তিনি তাঁদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন ছোটরা যাতে বড়দের শ্রদ্ধা ও সেবা করে। কারণ যে ভালোবাসার পেছনে সম্মানবোধ থাকে না সে ভালোবাসা অপূর্ণ। সম্মানবোধ ভালোবাসার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই হযরত হুসাইন (রাযি.) সবসময় হযরত হসান (রাযি.)-কে সম্মান করে চলতেন। তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দিতেন। তাঁর যে কোন কথা নির্দ্বিধায় মেনে চলতেন। যদি না তা অসঙ্গত কাজের নির্দেশ দেওয়া অভাবনীয় ছিল। তাই হযরত হসান (রাযি.) যখন হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)-এর পক্ষে খিলাফতের দাবি পরিত্যাগ করতে চাইলেন তখন হযরত হুসাইন (রাযি.) তা মেনে নিতে পারলেন না। কিন্তু যখন দেখলেন হযরত হাসান (রাযি.) তাঁর সিদ্ধান্তে অটল, তখন তিনি বললেন,

أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِ عَلِيٍّ، وَأَنْتَ خَلِيفَتُهُ، وَأَمْرُنَا لأَمْرِكَ تَبَعٌ، فَافْعَلْ مَا بُدَّا لَكَ.

'আপনি আমার চেয়ে বড়, আপনি খলীফা আর আমার গুরুজন, আপনাকে মানার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। অতএব আপনার কাছে যা উত্তম বলে মনে হয় তাই করুন।'[২]

---

[১] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৮৮৩, হাদীস: ২৪২৪

[২] আল-মিয্যী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ৬, পৃ. ২৪৮, ক্র. ১২৪৮

বস্তুত আমরা দেখি হযরত হসান (রাযি.)-এর ইন্তিকালের পরও হযরত হুসাইন (রাযি.) বড় ভাইয়ের নির্দেশ পালন করতে কুণ্ঠিত হননি। হযরত হাসান (রাযি.) নসীহত করে গিয়েছিলেন যাতে তাঁকে হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর রওযা মুবারকের পাশে দাফন করা হয়। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)ও এতে সম্মতি দিয়েছিলেন। কিন্তু মদীনার গভর্নর মারওয়া ইবনে হাকাম এ বিষয়ে প্রবল আপত্তি করেন। তাতে হযরত হুসাইন (রাযি.) খুবই মর্মাহত হন। তিনি বিষয়টি ফয়সালার জন্য তলোয়ার বের করেন। প্রিয় ভাইয়ের নসীহত পালনে তিনি শক্তি প্রয়োগের জন্যও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে হযরত হাসান (রাযি.) তাঁর দাফন নিয়ে কোন ফিতনা সৃষ্টি ও রক্তপাত না ঘটাতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। একথা শুনে হযরত হুসাইন (রাযি.) অস্ত্র সংবরণ করেন। তিনি ভাইয়ের অসীয়ত পালনের উদ্দেশ্যেই অস্ত্র ধারণে প্রস্তুত ছিলেন আবার সেই ভাইয়ের অসিতের কারণেই অস্ত্র ত্যাগে রাজি হন।

এতে প্রকাশ পেয়েছে বড় ভাইয়ের প্রতি ছোট ভাইয়ের ভালোবাসার গভীরতা। আর প্রকাশ পেয়েছে কীভাবে ভালোবাসার সাথে শ্রদ্ধার সংমিশ্রণ ঘটে থাকে তাও।

নানাজান নবী করীম (সা.)-এর দৃষ্টিতে হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর মর্যাদা

নবী করীম (সা.) হযরত হাসান (রাযি.) ও হযরত হুসাইন গভীরভাবে ভালোবাসতেন।

عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ﷺ يَلْعَبَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَفِي حِجْرِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتُحِبُّهُمَا؟ قَالَ: «وَكَيْفَ لَا أُحِبُّهُمَا وَهُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا أَشُمُّهُمَا».

‘হযরত আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রাযি.) বর্ণনা করেন, তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে দাওয়াতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে দেখলেন হযরত হুসাইন (রাযি.) কিছু ছেলের সাথে খেলছেন। তিনি তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলালাহ! আপনি কি তাঁদেরকে ভালোবাসেন? তিনি জবাবে বললেন, ‘আমি কীভাবে তাঁদের ভালো না বেসে পারি, যেখানে পার্থিব জীবনে তাঁরা আমার রায়হানা।’’[১]

---

[১] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ১৫৫, হাদীস: ৩৯৯০

عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ مُرَّةَ الْعَامِرِيِّ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ إِلَىٰ طَعَامٍ دُعُوْا لَهُ، فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي السِّكَّةِ، قَالَ: فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَامَ الْقَوْمِ، وَبَسَطَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَفِرُّ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَيُضَاحِكُهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّىٰ أَخَذَهُ، فَجَعَلَ إِحْدَىٰ يَدَيْهِ تَحْتَ ذَقْنِهِ، وَالْأُخْرَىٰ فِيْ فَأْسِ رَأْسِهِ فَقَبَّلَهُ وَقَالَ: «حُسَيْنٌ مِنِّيْ، وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، أَحَبَّ اللهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا».

হযরত ই'য়ালা ইবনে মুর্‌রা আল-আমিরী (রাযি.) বলেন, তিনি একদিন রাসূলুলাহ (সা.)-এর সাথে দাওয়াতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে দেখলেন হযরত হুসাইন (রাযি.) কিছু ছেলের সাথে খেলছেন। তিনি তাঁকে সাথে নিতে চাইলেন। কিন্তু শিশু হুসাইন একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে ছোটাছুটি করতে থাকলেন। আল্লাহর নবী (সা.)ও যে পর্যন্ত তাঁকে কব্জা করতে না পারলেন সে পর্যন্ত তাঁর সাথে ছোটাছুটি করতে থাকলেন। হাসান তাঁর ছোট এক হাত নবীজি (সা.)-এর ঘাড় মুবারকের নিচে রাখলেন। আর নবীজি (সা.) তাঁর মুখের ওপর মুখ রেখে চুমু খেতে বললেন, 'হুসাইন আমার থেকে আর আমি হুসাইন হুসাইন থেকে। যে হুসাইনকে ভালোবাসে আল্লাহ তাঁকে ভালোবাসেন। সে আমার দৌহিত্রের মধ্যে একজন। যে আমাকে ভালোবাসে সে যেন হুসাইনকে ভালোবাসে।"[১]

প্রিয় দৌহিত্রের প্রতি রাসূলে মকবুল (সা.)-এর ভালোবাসা কত গভীর ছিল এ হাদীস শরীফে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি তাঁকে সাথে সাথেই রাখতেন। এমনকি দাওয়াতেও শরীক করতেন। তাঁর শিশুসুলভ চপলতাকে সহাস্যে সহ্য করে যেতেন। স্নেহ-মমতায় তাঁকে চুমু খেতেন। তাঁর সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। বলতেন,

«حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِّنَ الْأَسْبَاطِ».

'হযরত হুসাইন উত্তম জাতির অংশ।'[২]

তিনি তাঁর পক্ষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে ফরিয়াদ

---

[১] (ক) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৫১, হাদীস: ১৪৪; (খ) ইবনে আসাকির, *তারীখু দামিশক*, খ. ১৪, পৃ. ১৪৮–১৪৯, ক্র. ১৫৬৬

[২] (ক) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৫১, হাদীস: ১৪৪; (খ) ইবনে আসাকির, *তারীখু দামিশক*, খ. ১৪, পৃ. ১৪৮–১৪৯, ক্র. ১৫৬৬

জানাতেন। তিনি মুসলিম জাতির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তাঁকে ভালোবাসতে। এটা এমন এক ভালোবাসা যা সহজেই আমাদের মনপ্রাণ ছুয়ে যায়।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: طَرَقْتُ رَسُوْلَ الله ﷺ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ لِبَعْضِ الْحَاجَةِ، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيَّ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَىٰ شَيْءٍ لَا أَدْرِيْ مَا هُوَ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِيْ قُلْتُ: مَا هَذَا الَّذِيْ أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ، فَكَشَفَ فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَىٰ وَرِكَيْهِ فَقَالَ: «هَذَانِ ابْنَايَ، وَابْنَا ابْنَتِي، اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّيْ أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

'হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রাযি.) বলেন, আমি এক বিশেষ প্রয়োজনবশত একবার রাসূলে করীম (সা.)-এর দরবারে যাই। তিনি বাইরে আসলেন। তাঁর পবিত্র হাত মুবারকে কিছু একটা ধরা ছিল কিন্তু তা কি আমি বুঝতে পারছিলাম না। প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেলে আমি জানতে চাইলাম, ইয়া রাসূলালাহ! আপনার বাহুতে কাকে ধারণ করে আছেন? অতঃপর তা তিনি প্রকাশ করলেন। আমি দেখলাম হাসান ও হুসাইন তাঁর পিঠের ওপর। তিনি বললেন, 'এরা আমার সন্তান এবং আমার কন্যার সন্তান। হে আলাহ! আপনি জানেন যে, আমি তাঁদের ভালোবাসি। অতএব আপনিও তাদের ভালোবাসুন।' এ কথা তিনি ৩ বার বললেন।'[১]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ الله ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَقُوْلُ: «أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ».

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আলাহর রাসূল (সা.) হাসান-হুসাইনের জন্য আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়ে বলতেন, 'আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে আমি তোমাদের পানাহ চাই, সমস্ত শয়তান, বিষাক্ত, নীচাশয় জীব ও ঈর্ষাপরায়ণ নজর হতে।''[২]

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَمَرَّ عَلَىٰ

---

[১] (ক) ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফীল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ৬, পৃ. ৩৭৮, হাদীস: ৩২১৮২; (খ) ইবনে আসাকির, *তারীখু দামিশক*, খ. ১৩, পৃ. ২৬, ক্র. ১২৯৫

[২] আত-তিরমিযী, *আল-জামি' উল কবীর*, খ. ৪, পৃ. ৩৯৬, হাদীস: ২০৬০

بَيْتِ فَاطِمَةَ، فَسَمِعَ حُسَيْنًا يَبْكِي ﷺ، فَقَالَ: «أَلَمْ تَعْلَمِيْ أَنَّ بُكاءَهُ يُؤْذِيْنِيْ»؟

'হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন রাসূল (সা.) হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর ঘর থেকে বেরিয়ে হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর গৃহের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি ফাতিমাতুয যাহরা (রাযি.)-কে ডেকে বললেন, 'হে যাহরা! তুমি কি জান না তার কান্না আমাকে পীড়া দেয়'? [১]

হযরত হুসাইন (রাযি.)ও রাসূলে করীম (সা.)-এর এ অতুলনীয় ভালোবাসাকে যথাযথ মর্যাদা দিতেন। তিনি কখনো তাঁর কাছ ছাড়া হতেন না। এমনকি আলাহ্‌র হাবীব (সা.) যখন খুতবা দিতে মিম্বরে দাড়াতেন তখনও তিনি তাঁর কাছে থাকতেন। এ কথা আমরা পূর্বেই জেনেছি যে, রাসূলে পাক (সা.)-এর সান্নিধ্য ও ভালোবাসা পেয়ে তিনি তাঁকে অনেক সময় সম্বোধন করতেন, 'হে আমার পিতা' বলে।

তাঁর প্রতি সাহাবাগণ (রাযি.)-এর ভালোবাসা ও সম্মানবোধ

রাসূলে করীম (সা.)-এর সাহাবীগণ (রাযি.) হযরত ইমাম হাসান (রাযি.) ও হযরত ইমাম হুসাইন (রাযি.)-এর প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করতেন। তাঁদেরকে মর্যাদার চোখে দেখতেন। তাঁদের কাছাকাছি থাকতে ভালোবাসতেন। এর অন্যথা হওয়ার কোন উপায়ও ছিল না। কারণ মহানবী (সা.) তাঁদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, 'যে আমাকে ভালোবাসে সে যেন তাদেরকে ভালোবাসে।' সাহাবাগণ (রাযি.)-এর পক্ষে সেটাই ছিল শোভন ও স্বাভাবিক। কারণ রাসূল (সা.) মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তাদেরকে ভালোবাসতে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। আর মহান আল্লাহ রাব্বুল যাকে ভালোবাসেন পৃথিবীর সব সৎকর্মশীল বান্দাই তাঁকে ভালোবাসে। হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর চেহারা রাসূলে করীম (সা.)-এর চেহারা মুবারকের সাথে মিল ছিল। তাই তাঁর উপস্থিতি সাহাবাগণকে (রাযি.) আলাহ্‌র প্রিয় হাবীব (সা.)-এর কথা মনে করিয়ে দিত। এতে তাঁর প্রতি তাঁদের ভালোবাসা আরো বেড়ে যেত।

---

[১] আত-তাবারানী, ***আল-মু'জামুল কবীর***, খ. ৩, পৃ. ১১৬, হাদীস: ২৮৪৭

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) হযরত হাসান (রাযি.) ও হযরত হুসাইন (রাযি.)-কে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তাঁদের নৈকট্য কামনা করতেন। কারণ তিনি তাঁদেরকেই বেশি ভালোবাসতেন যাঁদেরকে রাসূলে করীম (সা.) ভালোবাসতেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) লোকজনকে আহ্বান জানাতেন যেন তাঁরা রাসূলে করীম (সা.)-এর পরিবারের সদস্যদের ভালোবাসে ও যথাযথ মর্যাদা দেয়। তিনি বলতেন, 'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিবারের সদস্যদের সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। তিনি আরও বলতেন, সে সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার কাছে আমার নিজের আত্মীয়ের চেয়ে হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর আত্মীয়গণ বেশি প্রিয়।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.) হযরত হুসাইন (রাযি.) ও তাঁর ভাইকে খুবই সম্মানের চোখে দেখতেন। তাঁদেরকে যথাযথ মর্যাদা দিতেন। তাঁদের সাথে ঘনিষ্টতা বজায় রেখে চলতেন। হযরত ওমর (রাযি.) বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠার পর হযরত হাসান (রাযি.) ও হযরত হুসাইন (রাযি.) সহ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে ৫ হাজার দিরহাম করে ভাতার ব্যবস্থা করেন।[১]

عَنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: صَعِدتُ الْمِنْبَرَ إِلَىٰ عُمَرَ، فَقُلْتُ: انْزِلْ عَنْ مِنْبَرِ أَبِيْ، وَاذْهَبْ إِلَىٰ مِنْبَرِ أَبِيْكَ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِيْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْبَرٌ!، فَأَقْعَدَنِيْ مَعَهُ، فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ! مَنْ عَلَّمَكَ هَذَا؟ قُلْتُ: مَا عَلَّمَنِيْهِ أَحَدٌ، قَالَ: أَيْ بُنَيَّ! وَهَلْ أَنْبَتَ عَلَىٰ رُؤُوْسِنَا الشَّعْرَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ أَنْتُم! وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ، وَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ! لَوْ جَعَلْتَ تَأْتِينَا وَتَغْشَانَا.

'হযরত হুসাইন (রাযি.) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাযি.)-এর মিম্বরে আরোহণ করে বললাম, আমার পিতার মিম্বর ছেড়ে আপনার পিতার মিম্বরে গিয়ে উপবেশন করুন। তিনি বললেন, আমার পিতার কোন মিম্বর নেই। অতঃপর তিনি আমাকে তাঁর পাশে বসালেন। যখন তিনি মিম্বর হতে নেমে এলেন তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার ছেলে! কে এসব আপনাকে শিখিয়েছে? আমি বললাম,

---

[১] আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৩, পৃ. ২৮৫:

رَوَىٰ جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ عُمَرَ جَعلَ لِلْحُسَيْنِ مِثْلَ عَطَاءِ عَلِيٍّ خَمْسَةَ آلَافٍ.

কেউ আমাকে এটা শিখিয়ে দেয়নি। তিনি বললেন, হে আমার সন্তান! আলাহ্ এবং আপনারা ছাড়া আমাদের মাথায় এ চুল গজিয়েছেন কে? তারপর তিনি তাঁর মাথায় হাত বুলালেন এবং বললেন, হে আমার সন্তান! আপনি যদি আমাদের সাথে নিয়মিতভাবে সাক্ষাৎ করতেন... ।'[১]

عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ عُمَرَ كَسَا أَبْنَاءَ الصَّحَابَةِ؛ وَلَـمْ يَكُنْ فِيْ ذَلِكَ مَا يَصلُحُ لِلْـحَسَنِ وَالْـحُسَيْنِ؛ فَبَعثَ إِلَى اليَمَنِ، فَأُتِيْ بِكِسْوَةٍ لَـهُمَا، فَقَالَ: الْآنَ طَابَتْ نَفْسِيْ.

'ইমাম শিহাবউদ্দীন আয-যুহরী (রহ.) থেকে বর্ণিত, একবার হযরত ওমর (রাযি.)-এর কাছে ইয়েমেন থেকে কিছু কাপড় চোপড় এসেছিল। তিনি জনসাধারণের মাঝে এসব বিতরণ করে দিলেন। এমন সময় সেখানে হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রাযি.) উপস্থিত হলেন। তখন ইয়েমেনি কাপড় কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। এতে হযরত ওমর (রাযি.) খুবই ব্যথিত হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ইয়েমেনি প্রতিনিধির কাছে আরও কাপড় পাঠানোর জন্য খবর পাঠালেন। সেখান হতে পুনরায় কাপড় এলে তা থেকে দু'খণ্ড হযরত হাসান (রাযি.) ও হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, এখন আমি স্বস্তি পাচ্ছি।'[২]

عَنِ الْـحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْـخَطَّابِ يَوْمًا وَهُوَ خَالٍ بِمُعَاوِيَةَ وَابْنُ عُمَرَ بِالْبَابِ، فَرَجَعَ ابْنُ عُمَرَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَلَقِيَنِيْ بَعْدُ، فَقَالَ: لَـمْ أَرَكَ؟ فَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ الْـمُؤْمِنِيْنَ، إِنِّيْ جِئْتُ وَأَنْتَ خَالٍ بِمُعَاوِيَةَ وَابْنُ عُمَرَ بِالْبَابِ، فَرَجَعَ ابْنُ عُمَرَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ. فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ بِالْإِذْنِ مِنِ ابْنِ عُمَرَ، وَإِنَّمَا أَنْبَتَ مَا تَرَىٰ فِيْ رُءُوْسِنَا اللهُ، ثُمَّ أَنْتُمْ.

'হযরত হুসাইন (রাযি.) বলেন, একদিন আমি হযরত ওমর (রাযি.)-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)-এর সাথে

---

[১] (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১, পৃ. ৪৭১, হাদীস: ৭৫; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৩, পৃ. ২৮৫

[২] আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৩, পৃ. ২৮৫

একাকি ছিলেন। দরজায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি বেরিয়ে আসছিলেন। আমিও তার সাথে বেরিয়ে এলাম। পরে তাঁর [হযরত ওমর (রাযি.)] সাথে আমার দেখা হল তিনি বললেন, বহুদিন আপনার সাথে দেখা হয় না। আমি বললাম, ইয়া আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনার কাছে গিয়েছিলাম, আপনি হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)-এর সাথে একাকি ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)ও সেখানে ছিলেন। তিনি ফিরে আসছিলেন আমিও তাঁর সাথে ফিরে এসেছি। তিনি বললেন, হযরত আবদুলাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর চাইতে আমার কাছে আসার হক আপনার বেশি। আমাদের মাথায় যা গজিয়েছে তা আল্লাহর অনুগ্রহে আর আপনাদের পরিবারের উসীলায়।'[১]

عَنِ الْعَيْزَارِ بنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: بَيْنَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِيْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ، إِذْ رَأَى الْحُسَيْنَ، فَقَالَ: هَذَا أَحبُّ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَىٰ أَهْلِ السَّمَاءِ الْيَوْمَ.

'আল-আয়যার ইবনে হুরাইস বলেন, হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.) একদিন কাবার ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সে সময় হযরত হুসাইন (রাযি.)-কে দেখে তিনি বললেন, বেহেশবাসীদের চোখে আজকের দিনে পৃথিবীর পৃষ্ঠে বিচরণকারী মানুষের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন প্রিয়তম মানুষ।'[২]

وَقَدْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْخُذُ الرِّكَابَ لِلْحَسَنِ والْحُسَيْنِ إِذَا رَكِبَا، وَيَرَىٰ هَذَا مِنْ نِعَمِ اللهِ عَلَيْهِ. وَكَانَا إِذَا طَافَا بِالْبَيْتِ يَكَادُ النَّاسُ يُحَطِّمُونَهُمَا مِمَّا يَزْدَحِمُوْنَ عَلَيْهِمَا لِلسَّلَامِ عَلَيْهِمَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَأَرْضَاهُمَا.

'হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বহনকারী পশুদের তাঁদের [হযরত হাসান (রাযি.) ও হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর] কাছে নিয়ে আসতেন। এ কাজকে তিনি নিজের জন্য সৌভাগ্য বলে মনে করতেন। তাঁরা দু'জন যখন আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতেন লোকজন তাঁদের অভিনন্দন জানানোর জন্য ঘিরে ধরতেন। মনে হত লোকজনের ভিড়ে তাঁরা পিষ্ট হয়ে যাবেন। মহান আল্লাহ তাঁদের প্রতি

---

[১] আল-মিয্যী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ৬, পৃ. ৪০৪, ক্র. ১৩২২

[২] আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৩, পৃ. ২৮৫

সন্তুষ্ট থাকুন, তাঁরাও সন্তুষ্ট আছেন মহান আল্লাহর প্রতি।'[১]

আল্লাহর নবীর সাহাবায়ে কেরামগণ হযরত হাসান (রাযি.) ও হযরত হুসাইন (রাযি.)-কে তাঁদের বাল্য অবস্থা থেকেই ভালোবাসতেন। তাঁদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাঁদের প্রতি সাহাবায়ে কেরামগণের ভালোবাসাও বাড়তে থাকে। কারণ তাঁরা ছিলেন পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী। তাঁদের মহত্ব ও চরিত্র মাধুর্য সবারই মনোযোগ আকর্ষণ করত। সর্বোপরি আল্লাহর হাবীব রাসূলে করীম (সা.) তাঁদের খুবই ভালোবাসতেন। আর সাহাবায়ে কেরামগণ (রাযি.) সব কাজে রাসূলে করীম (সা.)-কে অনুসরণ করতেন।

হযরত ইমাম বুখারী (রাযি.) বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ الْـمَدِيْنَةِ، فَانْصَرَفَ فَانْصَرَفْتُ، فَقَالَ: «أَيْنَ لُكَعُ – ثَلاَثًا – ادْعُ الْـحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ». فَقَامَ الْـحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَمْشِيْ وَفِيْ عُنُقِهِ السِّخَابُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَقَالَ الْـحَسَنُ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَالْتَزَمَهُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّيْ أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ، وَأَحِبَّ مَنْ يُّحِبُّهُ».

'হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বলেছেন, আমি নবী করীম (সা.)-এর সাথে একদিন মদীনার বাজারে ছিলাম। তিনি বাজার থেকে ফিরলেন, আমিও তাঁর সাথে ফিরলাম। তিনি জানতে চাইলেন, 'ছোট শিশুটি কই?' তারপর বললেন, 'হাসান ইবনে আলীকে ডাক।' হযরত হাসান ইবনে আলী (রাযি.) আসলেন। তাঁর গলায় ছিল একটা হার। আল্লাহর নবী (সা.) এভাবে হাত বাড়িয়ে দিলেন, হযরত হাসান (রাযি.)ও তাই করলেন। তিনি তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ইয়া আল্লাহ! আমি তাঁকে ভালোবাসি, আপনিও মেহেরবানি করে তাঁকে ভালোবাসুন, আর ভালোবাসুন তাঁদের যারা তাঁকে ভালোবাসে।''[২]

তাঁর দয়া

হযরত হুসাইন (রাযি.) ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু। তার দানশীলতা ছিল প্রশংসাযোগ্য। তিনি কারো অনুরোধ উপেক্ষা করতেন না। দরিদ্রতার ভয়ে

---

[১] ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ৮, পৃ. ৪১

[২] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৭, পৃ. ১৫৯, হাদীস: ৫৮৮৪

দান করা থেকে তিনি বিরত থাকতেন না। এতে অবশ্য আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ তাঁর নানাজান হযরত রাসূলে করীম (সা.) মানুষদের মধ্যে সব শ্রেষ্ঠ। তাঁর দানশীলতা ছিল বাতাসের প্রবাহের মতো।

عَنِ الذَّيَّالِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ: خَرَجَ سَائِلٌ يَتَخَطَّىٰ أَزِقَّةَ الْـمَدِيْنَةِ حَتَّىٰ أَتَىٰ بَابَ الْـحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، فَقَرَعَ الْبَابَ، وَأَنْشَأَ يَقُوْلُ:

وَمَنْ لَّـم يَخْفَ الْيَوْمَ مِنْ رَّجَاكَ وَمَنْ * حَرَّكَ مِنْ خَلْفِ بَابِكَ الْـحَلْقَةِ

وَأَنْتَ جُوْدٌ، وَأَنْتَ مَعْدِنُهُ * أَبُوْكَ مَا كَانَ قَاتِلُ الْفَسَقَةِ

قَالَ: وَكَانَ الْـحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَاقِفًا يُصَلِّيْ، فَخَفَّفَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَخَرَجَ إِلَى الْأَعْرَابِيِّ، فَرَأَىٰ عليه أَثْرُ ضُرٍّ وَّفَاقَةٍ، فَرَجَعَ، وَنَادَىٰ بِقَنْبَرٍ، فَأَجَابَهُ: لَبَّيْكَ يَا ابْنَ رَسُوْلِ الله ﷺ! قَالَ: مَا تَبْقَىٰ مَعَكَ مِنْ نَفَقَتِنَا؟ قَالَ: مِائَتَا دِرْهَمٍ، أَمَرْتَنِيْ بِتَفْرِقَتِهَا فِيْ أَهْلِ بَيْتِكَ، قَالَ: فَهَاتِهَا ، فَقَدْ أَتَىٰ مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْهُمْ، فَأَخَذَهَا، وَخَرَجَ يَدْفَعُهَا إِلَى الْأَعْرَابِيِّ، وَأَنْشَأَ يَقُوْلُ:

خُذْهَا وَإِنِّيْ إِلَيْكَ مُعْتَذِرٌ * وَاعْلَمْ بِأَنِّيْ عَلَيْكَ ذُوْ شَفَقَةٍ

لَوْ كَانَ فِيْ سَيْرِنَا عَصَا تَمْدَادُا * كَانَتْ سِمَانًا عَلَيْكَ مُنْدَفِقَةٌ

لَكِنَّ رَيْبَ الْـمَنُوْنِ ذُوْ نَكَدٍ * وَالْكَفُّ مِنَّا قَلِيْلَةُ النَّفَقَةِ

قَالَ: فَأَخَذَهَا الْأَعِرَابِيُّ، وَوَلَّىٰ وَهُوَ يَقُوْلُ:

مُطَهَّرُوْنَ نَقِيَّاتُ جُيُوْبِهِمْ * تَجْرِي الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ أَيْنَمَا ذُكِرُوْا

وَأَنْتُمْ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ عِنْدَكُمْ * عِلْمُ الْكِتَابِ وَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّوَرُ

مَنْ لَّـمْ يَكُنْ عَلَوِيًّا حِيْنَ تُنْسَبُهُ * فَمَا لَهُ فِيْ جَمِيْعِ النَّاسِ مُفْتَخَرٌ

একবার এক ভিক্ষুক মদীনা শরীফের অলি-গলি ঘুরে হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর দরজায় এসে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগল,

আজকের দিনে যে কেউ আপনার কাছে হাত পাতবে
সে কখনো নিরাশ হবে না,
যে আপনার দরোজায় করাঘাত হানবে,

আপনি হচ্ছেন উদার হস্ত, বদান্যতার প্রতীক
আপনার মহান পিতা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে করেছেন লড়াই।

'হযরত হুসাইন (রাযি.) তখন প্রার্থনারত ছিলেন। ভিক্ষুকের হাঁক ডাক শুনে তিনি তাড়াতাড়ি নামায শেষ করে বাইরে এলেন। দেখলেন সাহায্যপ্রার্থীর চোখে-মুখে দরিদ্রতার ছাপ। তিনি তাঁর চাকর কাম্বরকে ডেকে পাঠালেন। কাম্বার বল, হে আলাহ্‌র নবী (সা.)-এর সন্তান! আমি হাযির। তিনি তাঁকে বললেন, আমাদের হাতে আর কতটুকু জমা আছে? সে বলল, আপনার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিলি করার মতো ২০০ দিরহাম মাত্র অবশিষ্ট আছে। তিনি বললেন, তা নিয়ে এসো, কারণ এমন একজন এখানে উপস্থিত হয়েছে যার প্রয়োজন আমার পরিবারের প্রয়োজনের চাইতে বেশি। তিনি সেই অর্থ বেদুইনের হাতে তুলে দিয়ে বললেন,

এটা রেখো, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই
আমার অন্তর তোমার জন্য বিগলিত
আমার যদি আরও থাকত, তাও আমি তোমাকে দিয়ে দিতাম।
উন্মুক্ত আকাশ হতে সম্পদের বারিপাত ঝরুক
তোমার মাথার ওপরে
কিন্তু ভাগ্যের ওপর সন্দেহ আমাদের
অসুখী করে রাখে।

বেদুইন তাঁর দান গ্রহণ করে যেতে যেতে বলল,

তাঁরা পাক-পবিত্র, যেমন পবিত্র তাঁদের সম্পদ, তাঁদের নাম যেখানেই উচ্চারিত হয় সেখানেই নাযিল আল্লাহর অবারিত রহমত। আর আপনি হচ্ছেন সুমহান, উচ্চশির, আপনার রয়েছে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান, আয়াতে কি বলা আছে তা আপনি জানেন উত্তমরূপে, আলীর পরিবার ছাড়া কারো অধিকার নেই অহংকারের।'[১]

হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাযি.)-এর দুয়ার হতে কেউ কোনদিন খালি হাতে ফিরে যায়নি। এমনকি কবিদেরও তিনি বিমুখ করতেন না।

عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، أَنَّ الْحَسَنَ كَتَبَ إِلَى الْحُسَيْنِ يَعِيْبُ عَلَيْهِ إِعْطَاءَ الشُّعَرَاءِ، فَقَالَ الْحُسَيْنُ: إِنَّ خَيْرَ الْمَالِ مَا وَقَى الْعِرْضَ.

---

[১] ইবনে আসাকির, *তারীখু দামিশক*, খ. ১৪, পৃ. ১৮৫, ক্র. ১৫৬৬

'হযরত ইবনে আওন থেকে বর্ণিত, কবিদের দান করার ব্যাপারে একবার হযরত হাসান (রাযি.) তাঁকে আপত্তি জানালে হযরত হুসাইন (রাযি.) বলেন, সেই অর্থই সর্বোত্তম যা একজন মানুষের মর্যাদা রক্ষা করে।'[১]

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ: قِيْلَ لِـمُحَمَّدِ بْنِ بَشِيْرٍ الْـحَضْرَمِيِّ: قَدْ أَسَرَّ ابْنَكَ بِثَغْرِ الرَّيِّ. قَالَ: عِنْدَ اللهِ أَحْتَسِبُهُ وَنَفْسِيْ مَا كُنْتُ أَحَبُّ أَنْ يُؤْسَرَ، وَلَا أَنْ أَبْقَىٰ بَعْدَهُ. فَسَمِعَ الْـحُسَيْنُ قَوْلُهُ، فَقَالَ لَهُ: رَحِمَكَ اللهُ أَنْتَ فِيْ حَلٍّ مِّنْ بَيْعَتِيْ فَاعْمَلْ فِيْ فِكَاكِ ابْنِكَ. قَالَ: أَكَلَتْنِي السِّبَاعُ حَيًّا إِنْ فَارَقْتَكَ. قَالَ: فَاعْطُ ابْنَكَ هَذِهِ الْأَثْوَابَ الْبُرُوْدَ يَسْتَعِيْنُ بِهَا فِيْ فِدَاءِ أَخِيْهِ، فَأَعْطَاهُ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ ثَمَنُهَا أَلْفُ دِيْنَارٍ.

'আসওয়াদ ইবনে কাইস থেকে বর্ণিত, একবার মুহাম্মদ ইবনে বশীর আল-হাযরামীকে বলা হয়, তাঁর পুত্র বন্দী হন। তিনি এ খবর শুনে বললেন, আমি তার জন্য এবং আমার জন্য আল্লাহর তরফ হতে পুরস্কার আশা করি। আমি তার বন্দী জীবন চাই না। তার অবর্তমানে আমি বেঁচে থাকতেও চাই না। হযরত হুসাইন (রাযি.) তার আহাজারি শুনে বললেন, আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন। আমার প্রতি দায়বদ্ধতা হতে আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। তুমি তোমার ছেলের মুক্তিপণ জোগাতে কাজ কর। সে বলল, বন্য পশু আমাকে জীবিত খেয়ে ফেলুক, যদি আমি আপনাকে ত্যাগ করে যাই। তিনি বললেন, তাহলে তোমার ছেলেকে এসব কাপড় পৌঁছে দাও, যাতে সে তার ভাইয়ের মুক্তিপণ হিসেবে তা ব্যবহার করতে পারে। এ বলে তিনি তাকে ৫ সেট কাপড় দিলেন যার মূল্য ছিল এক হাজার দিনার।'[২]

তাঁর ধার্মিকতা

হযরত হুসাইন (রাযি.) ছিলেন একজন সাচ্চা ঈমানদার, অত্যন্ত আল্লাহভীরু ও গভীর ধর্মপরায়ণ। আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা তিনি কখনো

---

[১] আল-মিয্যী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ৬, পৃ. ৪০৭, ক্র. ১৩২২
[২] আল-মিয্যী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ৬, পৃ. ৪০৭, ক্র. ১৩২২

লঙ্ঘন করেননি। তিনি ছিলেন সৎকর্মশীল, সালাত আদায়কারী ও নিয়মিত রোযা পালনকারী। বহুবার হজ্জ পালন করেছেন তিনি। দানশীলতা ও পুণ্যকর্ম সাধনে তিনি ছিলেন সুপরিচিত। বহুবিধ সমাজকল্যাণমূলক কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন।[১]

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ، حَدَّثَنِيْ مُصْعَبٌ، قَالَ: حَجَّ الْحُسَيْنُ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ حَجَّةً مَّاشِيًا.

'আয-যুবায়ের ইবনে বক্কর বলেন, মুসা'আব আমাকে জানিয়েছেন, হযরত হুসাইন (রাযি.) পদব্রজে (মদীনা হতে মক্কায়) ২৫ বার হজ্জ করেছেন।'[২]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শাহী দরবারে তাঁর আকুতি ও আজহারি দেখলে তাঁর উচ্চ ধর্মাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! জীবনের প্রতিটি দুঃখ-দুর্দশায় আমি আপনার উপরেই নির্ভর করি। প্রতিটি বিপদেই আমি আপনার ওপর ভরসা করি। আমি যে অবস্থায় থাকি না কেন, সর্বাবস্থায়ই আপনি হচ্ছেন নির্ভরতার স্থল, আমার অর্জিত সকল নিয়ামত আপনারই দান এবং আপনিই এই সকল কল্যাণের উৎস।

তাঁর প্রার্থনার ভাষার আরও নমুনা, 'হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে সংরক্ষণ করেছেন কিন্তু আমার কৃতজ্ঞ পাননি। আমাকে পরীক্ষা করেছেন কিন্তু ধৈর্যশীল পাননি। তবুও আমার অকৃতজ্ঞতার কারণে আপনি আমাকে রিয্ক থেকে বঞ্চিত করেননি। আমি অধৈর্য হওয়া সত্ত্বেও আপনি আমার বিপদকে স্থায়ী করেননি। শ্রেষ্ঠতম দয়ালু প্রভুর কাছ থেকে দয়া ও করুণা ছাড়া বিপরীত কিছুই নাযিল হয় না।

তাঁর প্রতিটি মুনাজাতেই আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনের সকল ভয় ও আশা তিনি মহামহিম আল্লাহর ওপরই সোপর্দ করতেন। কার্যকারণের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তিকে তিনি স্বীকার করতেন না। কারণ আল্লাহই অকল্যাণ বা কল্যাণ করার একমাত্র মালিক, তিনি পরম দাতা, হায়াত ও মউতের তিনিই একমাত্র মালিক। এ পর্যায়ের তাওয়াক্কুল অর্জন করার ক্ষমতা খুব বেশি মানুষের থাকে না। ইবাদতে একগ্রতা, আনুগত্যে বিনীত সমর্পণ, আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের লাগাতার প্রচেষ্টা

---

[১] ইবনুল আসীর, *উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা*, খ. ২, পৃ. ২৪, জীবনী: ১১৭৩

[২] ইবনুল আসীর, *উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা*, খ. ২, পৃ. ২৪, জীবনী: ১১৭৩

ছাড়া মানুষ তা অর্জন করতে পারেনা। নিয়মিত ইবাদত, সিয়াম পালন, হজ্জ সমাপণ, কুরআন তিলাওয়াত ও যিক্‌র ছাড়া কেউ আল্লাহর এমন নৈকট্য হাসিল করতে পারে না। হযরত হুসাইন ছিলেন তেমনিই এক বিরল ব্যক্তিত্ব।

হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর মতো ব্যক্তির পক্ষে এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নন। কারণ তিনি ছিলেন হযরত আলী (রাযি.)-এর সন্তান। ইসলামী ফিক্বাহ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল খুবই গভীর। প্রকৃত জ্ঞানই মানুষের মনে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে। জ্ঞানীরাই আল্লাহ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা রাখে। তারাই আল্লাহর বন্দেগীতে অধিক অগ্রসর। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ

'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই আল্লাহকে বেশি ভয় করে।'[১]

তাঁর সাহসিকতা ও সংগ্রাম

হযরত হুসাইন (রাযি.) ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। অকুতোভয় সৈনিক। জিহাদের ডাকে প্রয়োজনের মুহূর্তে সাড়া দিতে কখনো পিছপা হতেন না তিনি।

وَعَنْ سَعِيْدِ بنِ عَمْرٍو: أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ لِلْحُسَيْنِ: وَدِدْتُ أَنَّ لِيْ بَعضَ شِدَّةِ قَلْبِكَ. فَيَقُوْلُ الْحُسَيْنُ: وَأَنَا وَدِدْتُ أَنَّ لِيْ بَعْضَ مَا بُسِطَ مِنْ لِسَانِكَ.

'হযরত সাঈদ ইবনে আমর (রাযি.)-এর বরাতে বলা হয়েছে, তিনি বলেন, একদিন হযরত হাসান (রাযি.) হযরত হুসাইন (রাযি.)-কে বলেন, আমি যদি আপনার মতো দৃঢ় মনোবলের অধিকারী হতে পারতাম। আর হযরত হুসাইন (রাযি.) হযরত হাসান (রাযি.)-কে বলেন, আমি যদি আপনার মতো চমৎকার ভাষা-শৈলীর অধিকারী হতে পারতাম!।'[২]

তাঁকে একবার হযরত মুরাবিয়া (রাযি.)-এর নিকট দূত হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। তিনি সামরিক বাহিনীর সাথে কনস্টান্টিনোপলে (ইস্তাম্বুল অভিযানের) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সে যুদ্ধে সেনাপতি ছিলেন ইয়াযীদ ইবনে মু'আবিয়া। এতে হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর মহত্ত্বই প্রকাশ পায়। তাঁর এবং হযরত মুরাবিয়া (রাযি.)-এর সম্পর্ক যাই থাকুক না কেন, যখনই আলাহর

---

[১] আল-কুরআন, ***ফাতির***, ৩৫:২৮

[২] আয-যাহাবী, ***সিয়ারু আ'লামিন নুবালা***, খ. ৩, পৃ. ২৮৭, ক্র. ৪৮

পথে যুদ্ধের আহ্বান এসেছে তখনই তিনি তাতে সাড়া দিয়েছেন। শুধু আল্লাহর ধর্মের মর্যাদা রক্ষার জন্যই তিনি তা করেছিলেন।

হযরত হুসাইন (রাযি.) ইরাকের কুফায় যেতে মনস্থ করলে হযরত আমারা বিনতে আবদুর রহমান তাঁকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেন। তিনি হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন,

عَنْ عَائِشَةَ، تَقُوْلُ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «يُقْتَلُ الْحُسَيْنُ بِأَرْضِ بَابِلَ»، فَلَمَّا قَرَأَ كِتَابَهَا قَالَ: فَلاَ بُدَّ لِيْ إِذًا مِّنْ مَصْرعِيْ، وَمَضَىٰ.

'হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'ব্যবিলনের ভূমিতে হযরত হুসাইন (রাযি.) নিহত হবেন।' একথা শুনে হযরত হুসাইন (রাযি.) বলেন, তাহলে আমার পক্ষে মৃত্যু হতে পালিয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই।'[১]

পবিত্র নগরী যাতে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায় সে জন্যই তিনি মক্কা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِلْحُسَيْنِ: أَيْنَ تَذْهَبُ؟ إِلَىٰ قَوْمٍ قَتَلُوْا أَبَاكَ وَطَعَنُوْا أَخَاكَ؟ فَقَالَ: لِأَنْ أُقْتَلَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تُسْتَحَلَّ بِيْ يَعْنِي مَكَّةَ.

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযি.) তাঁকে বললেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? এমন লোকদের কাছে কি আপনি যাচ্ছেন যারা আপনার পিতাকে হত্যা করেছে, ভাইয়ের বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়েছে, তিনি জবাবে বললেন, পবিত্র মক্কা নগরীতে রক্তপাত হওয়ার চেয়ে আমার মৃত্যু অধিক শ্রেয়।'[২]

হযরত মু'আবিয়া (রাযি.) ইরাকে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁকে হুশিয়ার করে দেন। কিন্তু হযরত হুসাইন (রাযি.) প্রত্যুত্তরে জানালেন, আপনার চিঠি আমার হস্তগত হয়েছে। আমার সম্পর্কে আপনার কাছে যে সংবাদ পৌঁছেছে আমি তার যোগ্য নই। আল্লাহর মেহেরবানি ছাড়া কেউ কোন সৎকাজ করতে পারে না। আমি যদি আপনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিত্যাগ করি তাহলে আমার আশঙ্কা হয় আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন না। আর আপনি ক্ষমতা দখল করে যেভাবে এ জাতির ঘাড়ের ওপর চেপে বসেছেন তার চেয়ে বড় ফেতনা আর হতে পারে না।

---

[১] ইবনে আসাকির, *তারীখু দামিশক*, খ. ১৪, পৃ. ২০৯, ক্র. ১৫৬৬

[২] ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ৮, পৃ. ১৭৪

হযরত মু'আবিয়া (রাযি.) বলেন, 'আবু আবদুলাহ (হুসাইন) সম্পর্কে আমরা যা জানি তা হচ্ছে তিনি ছিলেন সিংহের মতো সাহসী। যা সত্য বলে তিনি বিশ্বাস করতেন তা আঁকড়ে ধরতে তিনি কখনো পিছপা হতেন না, যদিও এতে তাঁর মৃত্যুরও ঝুঁকি থাকত।' বস্তুত তাঁর জীবনে তাই সত্য হয়েছিল।

বাগ্মিতা

তিনি ছিলেন পরম বাগ্মী ও শিল্পীত মানুষ। তিনি যখন কথা বলতেন তা যেন কথা নয়, যেন তাঁর মুখ ঝরে পড়ছে মুক্তার দানা। তাঁর বক্তৃতা শ্রোতার মনকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত, তাঁদের হৃদয়কে করে রাখত আচ্ছন্ন। উপস্থিত বক্তৃতার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। হযরত ওসমান (রাযি.)-এর খিলাফতকালে হযরত মু'আবিয়া (রাযি.) শাম (সিরিয়া) থেকে হযরত আবু যর আল-গিফারী (রাযি.)-কে বহিষ্কার করলে তিনি মদীনা শরীফ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন তখন হযরত হুসাইন (রাযি.) এক অনির্ধারিত বক্তৃতায় বলেন, 'হে চাচাজান! আপনি যা দেখেছেন আল্লাহ অবশ্যই তা পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখেন এবং প্রত্যেক দিনই আল্লাহ নতুন নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনয়ন করে থাকেন। লোকজন দুনিয়ার স্বার্থে আপনাকে পরিত্যাগ করেছে আর আপনি তাদের পরিত্যাগ করেছেন দীনের কারণে। অতএব আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে ধৈর্য ও সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করুন। প্রবৃত্তির তাড়না ও মানসিক উদ্বেগ থেকে তাঁর কাছেই আশ্রয় ভিক্ষা চান। কারণ ধৈর্য দীনেরই অঙ্গ ও মহৎ গুণ। কেবল ইচ্ছার তাড়নায় মানুষ অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না এবং নির্ধারিত সময় শেষ না হলে উদ্বেগও নিরসন হয় না।

তাঁর লিখিত কিছু কবিতার মধ্যে নিম্নোক্তটি অন্যতম:

যদি দুনিয়ার জীবনকে বেশি মূল্যবান মনে করা হয়,
স্মরণ রেখ আল্লাহর পুরস্কার তার চেয়েও উচ্চ মর্যাদার ও অতীব চমৎকার।
যদি দেহকে তৈরি করা হয়েছে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য তাহলে
তলোয়ারের আঘাতে মৃত্যুই অধিক শ্রেয়।
পৃথিবীর সমস্ত সম্পদকেই যদি মৃত্যুর মাধ্যমে ছেড়ে যেতে হয় তাহলে
সম্পদ বিলিয়ে দিলে ক্ষতি বা কী?
দু'দিনের এই নিয়ে সম্পদ কেনইবা এত কৃপণতা।

তাঁর আরেকটি কবিতা হচ্ছে,

সৃষ্টির মুখাপেক্ষি হয়ো না
নির্ভর হয়ে নির্ভর করো স্রষ্টার ওপর
সত্যবাদী হোক কিংবা মিথ্যাবাদী, কারো হাতে

মিটবে না তোমার কোন প্রয়োজন ।
মহান আলাহ্‌র অফুরন্ত ভাণ্ডার হতে তালাশ করো
তোমার রিয্‌ক ।
তিনি ছাড়া রিযিকের মালিক আর কেউ নয় ।
যে বিশ্বাস করে মানুষই তার প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা রাখে
বুঝতে হবে পরম দয়াল দাতার প্রতি
তাঁর বিশ্বাস অনিশেষ শূন্য ।

তাঁর অন্যান্য কবিতার মধ্যে নিচেরটি অন্যতম:

একজন সম্পদশালী যখন আরও সম্পদের অধিকারী হয়ে পড়ে তার উদ্বেগ ক্রমশ বেড়ে যায়, সম্পদ গ্রাস করে ফেলে তার সমগ্র সত্তা ।

আমরা তোমাকে চিনি,
হে জীবনে ফিতনা সৃষ্টিকারী,
অধীনস্থদের বোঝা যায় ঘাড়ে চেপে বসে
তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় ত্যাগের মহিমাকে শিরোধার্য করা ।

তাঁর এসব অনবদ্য কবিতা, মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা ও বিজ্ঞতা ছাড়াও তিনি ছিলেন ইসলামী ফিকহ-শাস্ত্রের একজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত এবং প্রজ্ঞাবান শিক্ষক ।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْكَلْبِيِّ، قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ لِّرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ إِذَا دَخَلَتْ مَسْجِدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَرَأَيْتَ حَلْقَةً فِيْهَا قَوْمٌ كَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوْسِهِمِ الطَّيْرُ، فَتِلْكَ حَلْقَةُ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ مُؤْتَزِرًا عَلَىٰ أَنْصَافِ سَاقِيْهِ لَيْسَ فِيْهَا مِنَ الْهُزَيْلَا شَيْءٌ.

'হযরত মু'আবিয়া (রাযি.) কুরাইশ বংশীয় একজন লোককে একবার বলেছিলেন, মসজীদে নববীতে যখন তুমি একদল লোককে চক্রাকারে নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে দেখবে যে মনে হবে তাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে, ধরে নেবে যে, তা হচ্ছে আবু আবদুল্লাহ (হুসাইন) পাঠচক্র গোষ্ঠী যার জামা হাতের কব্জির অর্ধেকাংশ পর্যন্ত প্রলম্বিত ।'[১]

যে কথায় তাঁর ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠে

সত্যবাদি মানুষের কথাতেই তাঁদের ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে । নিঃসন্দেহে হযরত হুসাইন (রাযি.) ছিলেন পরম সত্যবাদী । তাঁর বক্তব্যের মাঝেই

---

[১] ইবনে আসাকির, *তারীখু দামিশক*, খ. ১৪, পৃ. ১৭৯, ক্র. ১৫৬৬

একজন স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মর্যাদাবান মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলতেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ! কল্যাণকর কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা কর, সৎ কাজে প্রবৃত্ত হও, বদান্যতার মাধ্যমে প্রশংসা অর্জন কর; এবং স্মরণ রেখ, আমর বিল মারুফের (ইসলামী তাওহীদ ও সৎ কর্ম) মধ্যেই নিহিত রয়েছে সুনাম ও সাফল্য।

তিনি আরও বলতেন, যে দানশীল সে-ই সম্মানিত হবে, যে কৃপণ সে লাঞ্চিত হবে। আপন প্রয়োজনের অর্থ বিলিয়ে দেওয়ার মাঝেই রয়েছে মহত্ত্ব। প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ক্ষমা করে দেয় সে-ই সমচেয়ে উত্তম। আত্মীয়তার বন্ধনকে যে অটুট রাখে সে-ই শ্রেষ্ঠ। যে অন্যকে ইহসান কওে আল্লাহ তাকে ইহসান (অনুগ্রহ) করেন, কারণ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।

কারবালায় তাঁর শাহাদাত

হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাযি.) ৬১ হিজরীর ১০ মুহাররম পবিত্র আশুরার দিনে ইরাকের কারবালা প্রান্তরে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর শাহাদাত সম্পর্কে প্রিয় নবী (সা.) ভবিষ্যতবাণী করে গিয়েছিলেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِمَا وَهُوَ يَبْكِيْ، قَالَتَا: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيْلَ أَخْبَرَنِيْ أَنَّ ابْنِي الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ، وَبِيَدِهِ تُرْبَةٌ حَمْرَاءُ، فَقَالَ: هَذِهِ تُرْبَةُ تِلْكَ الْأَرْضِ».

‘হযরত আবদুলাহ ইবনে সাঈদ (রাযি.) তাঁর পিতার বরাত দিয়ে বলেন, হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.) অথবা হযরত উম্মে সালমা (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আলাহর হাবীব (সা.) তাঁকে বলেছেন, ‘আজ আমার কাছে একজন ফেরশতা এসেছিলেন যাঁকে আমি ইতঃপূর্বে আর দেখিনি।’ তিনি বললেন, ‘অবশ্যই হুসাইন মৃত্যুবরণ করবে, আপনি চাইলে আমি ধূলার মাঝে তাঁর রক্তের দাগ আপনাকে দেখাতে পারি।’’[১] [এই বইয়ের ইংরেজি অনুবাদকের মতে হাদীসটি দুর্বল।]

حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ، فَأُخْبِرَ أَنَّ الْحُسَيْنَ قَدْ

[১] আল-খলীলী, *আল-ইরশাদ ফী মা'রিফাতি ওলামায়িল হাদীস*, খ. ১, পৃ. ৩০৭, হাদীস: ৪৭

توجَّه إِلَى الْعِرَاقِ، فَلَحِقَهُ عَلَىٰ مَسِيْرَةِ لَيْلَتَيْنِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ: الْعِرَاقَ، وَمَعَهُ طَوَامِيْرُ وَكُتُبٌ، فَقَالَ: لاَ تَأْتِهِم. قَالَ: هَذِهِ كُتُبُهُم وَبَيْعتُهُم، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ خَيَّرَ نَبِيَّهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَاخْتَارَ الْآخِرَةَ، وَإِنَّكُم بَضْعَةٌ مِّنْهُ لَا يَلِيْهَا أَحَدٌ مِّنْكُم أَبَداً، وَمَا صَرَفهَا اللهُ عَنْكُم إِلَّا لِلَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ لَكُم، فَارْجِعُوْا، فَأَبَىٰ، فَاعْتَنَقَهُ ابْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ مِنْ قَتِيْلٍ.

'আশ-শা'বী বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) মদীনায় এসে জানতে পারলেন যে, হযরত হুসাইন (রাযি.) ইরাক অভিমুখে রওনা দিয়েছেন তখন তিনি তাঁর খোজে দ্রুত রওনা হলেন। মদীনা শরীফ থেকে দু'দিনের রাস্তায় তিনি তাঁর সাথে মিলিত হন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় যাচেছন? তিনি জবাব দিলেন, ইরাক। তাঁর সাথে বিভিন্ন বই ও কাগজপত্র ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বললেন, তাদের কাছে যাবেন না। তিনি জবাব দিলেন এসব চিঠি ও কাগজপত্রে তাদের আনুগত্যের বিবরণ আছে। তিনি তখন বললেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর প্রিয়নবী (সা.)-কে এ দুনিয়া এবং আখেরাতের মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার এখতিয়ার দিয়েছিলেন। তিনি আখিরাতের জীবনকে বেছে নিয়েছেন। আপনি তাঁরই বংশধর। আপনাদের কেউ এতে সফল হবেন না। (তিনি খিলাফতের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন) আল্লাহ এ দায়িত্ব আপনাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে বৃহত্তর কল্যাণের দিকেই আপনাদের ধাবিত করেছেন। সুতরাং ফিরে চলুন। কিন্তু হযরত হুসাইন (রাযি.) তাকে অস্বীকৃতি জানালেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর পর তাঁর সাথে কোলাকুলি করলেন আর তাঁকে আল্লাহর সুরক্ষার মাঝে সোপর্দ করলেন এবং বললেন, আলাহ আপনাকে মৃত্যু থেকে হিফাজত করুন।'[১]

কুফার লোকজন তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিল। তারা এ বিষয়ে তাঁকে চিঠি লিখে নিশ্চিত করেছিল। কিন্তু তারা নিজেদের শপথ ভঙ্গ করে তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তিনি কারবালায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। তাঁর সাথে ৫০ জনের মতো দেহরক্ষী ছিলেন। তাঁরা তাঁর শাহাদতের

---

[১] ইবনে আসাকির, *তারীখু দামিশক*, খ. ১৪, পৃ. ২০২, ক্র. ১৫৬৬

পূর্ব মুর্হূত পর্যন্ত প্রাণপণ লড়াই করে গিয়েছিলেন। তিনি চারিত্রিক দৃঢ়তা, সংকল্পে অনমনীয়তা, সাহস, সত্যের প্রতি অবিচল আস্থা ও মিথ্যার মুকাবেলায় পিছপা না হওয়ার জীবন্ত উদাহরণ সৃষ্টি করে গিয়েছেন। শাহাদত বরণের আগমুহূর্ত পর্যন্ত অসীম সাহসী হযরত হুসাইন (রাযি.) শত্রুবাহিনীর ৮০ জনকে হত্যা করেছিলেন। সে দিন কারবলা ময়দানে তিনি এবং নবী-বংশের নারী, শিশু-কিশোরসহ ৭২ জন শহীদ হয়েছিলেন তাঁর একমাত্র জীবিত অসুস্থ সন্তান হযরত যয়নুল আবেদীন (রহ.)-সহ শিশু ও মহিলাগণ ইয়াযীদ বাহিনীর হাতে বন্দী হন।

চতুর্দিক হতে আক্রমণ চলল। হযরত হুসাইন (রাযি.)ও তরবারি চালাতে আরম্ভ করলেন। তিনি তরবারি নিয়ে পদাতিক বাহিনীর দিকে ধাবমান হলেন। একাই তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আম্মার এ যুদ্ধে শরীক ছিল। তার বর্ণনা এরূপ:

আমি বর্শা দ্বারা হযরত হযরত হুসাইন (রাযি.)-কে আক্রমণ করেছিলাম। একেবারে তাঁর সন্নিকটে পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমি ইচ্ছা করলে তখনই তাঁকে হত্যা করতে পারতাম, কিন্তু এত বড় পাপ মাথায় কিরূপে নেব, তা ভেবে পশ্চাৎপদ হলাম। ডান বাম সবদিক দিয়েই তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন কিন্তু তিনি যেদিকে ফিরতেন, সেদিকেই ইয়াযীদ বাহিনীকে ভেড়ার পালের ন্যায় বিতাড়িত করে নিয়ে যেতেন। দেহে লম্বা জুব্বা, মাথায় পাগড়ি বাঁধা অবস্থায় অলৌকিক শক্তি বলে তিনি শেষ পর্যন্ত একাই লড়ে যাচ্ছিলেন। আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি এরূপ ভগ্নহৃদয় ব্যক্তি, যার পরিবারের সকলেই একের পর এক তাঁর চোখের সামনে শত্রুর হাতে নিহত হয়েছেন, সেই মানুষের মধ্যে এরূপ বীরত্ব, সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা এবং স্থিরতা আমি জীবনে আর কখনো কারো কাছে দেখিনি। তিনি ডানে বামে যেদিকেই ফিরতেন, সেই দিকেই শত্রুদল ব্যাঘ্রতাড়িত ভীরু মেষপালের ন্যায় ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করত। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এ অবস্থা চলল। এই সময় তাঁর বোন হযরত যয়নব বিনতে আলী (রাযি.) একবার তাবুর বাইরে এসেছিলেন। তাঁর কানে ধূলো-বালি দুলছিল। তিনি চিৎকার করে রোদন করছিলেন, আকাশ কেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে না...। এ সময় ওমর ইবনে সা'দ হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর একেবারে নিকটবর্তী হয়ে পড়েছিলেন। হযরত যয়নব (রাযি.) চিৎকার করে বললেন, হে ওমর! আবু আবদুল্লাহ [হুসাইন (রাযি.)] কী তোমার চোখের সামনেই কতল হয়ে যাবে? ওমর তখন যয়নবের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে

নিলেন। তার চেহারা এবং দাড়ি বয়ে অশ্রু ঝরছিল।[১]

যুদ্ধের ময়দানে হযরত হুসাইন (রাযি.) পিপাসায় খুব কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তিনি পানির জন্য ফোরাতের দিকে চললেন কিন্তু শত্রুরা বাধা দিল। ঠিক সে সময় হঠাৎ একটি তীর এসে তাঁর কণ্ঠনালীতে বিদ্ধ হল। তিনি নিজ হাতে তীরটি টেনে বের করে হাত মুখের দিকে উত্তোলন করলেন, হাতের অঞ্জলি রক্তে ভরে গেল। তিনি সে লহু-সিঞ্চিত অঞ্জলি আসমানের দিকে তুলে শুকরগুযারী করতে করতে বললেন, হে আল্লাহ! আমার ফরিয়াদ কেবল তোমারই দরবারে। দেখ তোমার রাসূলের বংশধরদের প্রতি কি ব্যবহার চলছে! তিনি শিবিরের দিকে ফিরে যেতে চাইলেন। কিন্তু শিমারের সাথীরা তাতেও বাধা দিল। তিনি বুঝলেন, তাদের উদ্দেশ্য ভালো নয়, তারা তাঁবু লুট করার মতলব আঁটছে। তা অনুভব করে তিনি শিমারকে বললেন, তোমাদের যদি দীন-ধর্ম না থাকে, পরকালের ভয় না থাকে, তবে অন্তর পার্থিব ভদ্রতা বিসর্জন দিও না। অসভ্য এবং বর্বরদের হাত হতে আমার (পরিবারবর্গের) তাঁবু রক্ষা করিও। শিমার বলল, তাই হবে, আপনার তাঁবুর ওপর কোনরূপ আক্রমণ করা হবে না। দীর্ঘ সময় এভাবে চলে গেল। শত্রুরা ইচ্ছে করলে বহু পূর্বেই তাঁকে হত্যা করে ফেলতে পারত। কিন্তু কেউই এই মহাপাপের বোঝা নিজ মাথায় নেয়ার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল না। অবশেষে শিমার সৈন্যদেরকে ধমক দিয়ে বলল, তোমাদের সর্বনাশ হোক! তোমরা এখনও দেরি করছ কেন? দ্রুত কাজ সমাপ্ত কর। আবার চতুর্দিক হতে আক্রমণ শুরু হল। হযরত হুসাইন (রাযি.) বললেন, তোমরা আমাকে হত্যা করার জন্য একে অপরকে উত্তেজিত করছ কেন? আল্লাহর কসম! আমাকে হত্যা করলে আল্লাহ যত না খোশ হবেন, আর কাউকে হত্যা করলে তিনি সে পরিমাণ নাখোশ হবেন না। কিন্তু অন্তিম সময় উপস্থিত হল।

যুর'আ ইবনে শরীক আত-তামামী হযরত হুসাইন (রাযি.)-কে বাম হাত জখম করে ফেলল এবং পুনরায় বাহুর ওপর তরবারি দ্বারা আঘাত করল। তিনি অবসন্ন দেহে মাটিতে ঢলে পড়ে যাচ্ছিলেন। তা দেখে শত্রুগণ ভীত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পাষণ্ড সানান ইবনে আনাস আন-নাখফী অগ্রসর হয়ে হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর দেহে বর্শা দ্বারা আঘাত করলেই তিনি ভূতলে পড়ে গেলেন। সানান আর একজনকে মস্তক ছেদন করতে বলল। সে লাফিয়ে মস্তক ছেদনে অগ্রসর হল কিন্তু তার সাহস হল না, পিছিয়ে গেল। সানান দাঁত কড়মড় করে বলল, তোর হাত অবশ হউক। এই বলে নিজেই ভূতলে

---

[১] আত-তাবারী, ***তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক***, খ. ৫, পৃ. ৫৫২

ধরাশায়ী হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর দেহের ওপর লাফিয়ে পড়ল। প্রথমে হযরত হুসাইন (রাযি.)-কে যবেহ করল, তারপর তাঁর পবিত্র দেহ হতে মস্তক দ্বি-খণ্ডিত করে ফেলল। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।[১]

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: وُجِدَ بِالْحُسَيْنِ حِيْنَ قُتِلَ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُوْنَ طَعْنَةً، وَأَرْبَعٌ وَّثَلَاثُوْنَ ضَرْبَةً.

'জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ আলী (রহ.) বলেছেন, নিহিত হওয়ার পরে হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর দেহে ৩৩টি বর্শার আঘাত এবং ৩৪টি তরবারির আঘাত দেখা গিয়েছিল।'[২]

শোকগাঁথা

নবী-দৌহিত্র শহীদ হুসাইন (রাযি.)-এর পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে অনেক শোকগাথা রচিত হয়েছে। এতে সকল স্তরের মুসলমানদের তরফ হতে তাঁর প্রতি গভীর ভালোবাসা ও স্নেহ-মমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এটা খুবই যথার্থ। কারণ এটা সুস্পষ্ট যে তাঁর প্রতি চরম জুলুম করা হয়েছে। আর মানুষ কখনো অন্যায়কে সমর্থন করে না। অধিকন্তু তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র বংশধরদের একজন। কারবালা প্রান্তরে শহীদ হয়েছেন তাঁদের উদ্দেশ্য হযরত ইমাম শাফিয়ী (রাযি.)-এর রচিত সারা পৃথিবীর হৃদপিণ্ড পর্বতের সুউচ্চ চূড়াও তাদের জন্য হয়ে গেছে কবিতাও রয়েছে। সে সবের কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল:

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিবার পরিজনের জন্য
বার বার কেঁপে ওঠছে সারা পৃথিবীর হৃদপিণ্ড
পর্বতের সুউচ্চ চূড়াও তাদের জন্য হয়ে গেছে মিসমার।
তিনি শহীদ হয়েছেন, অথচ ছিল না তাঁর কোন অপরাধ।
উরজুয়ানের জলে যেন ডুবানো হয়েছে তাঁর জামা
আর এতেই তা হয়ে পড়েছে রক্তরঙ্গীন।
হাশিমী বংশের মনোনীত উজ্জ্বল নক্ষত্রের প্রতি
আমরা অহরহ পাঠ করি দরূদ

---

[১] (ক) আত-তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, খ. ৫, পৃ. ৫৫২–৫৫৩; (খ) ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ১১, পৃ. ৫৪৫–৫৫০

[২] আত-তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, খ. ৫, পৃ. ৫৫৩

আর তাঁরই আত্মার সাথে আমরা করি লড়াই
এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কী হতে পারে!

নবীর পরিজনদের প্রতি ভালোবাসা যদি কোন গোনাহ হয়ে থাকে তাহলে এ পাপের জন্য আমার মোটেও কোন আক্ষেপ নেই।

হযরত আবদুল মত্তালিবের বংশীয় এক রমনীর রচিত শোকগাঁথা

কী জবাব দেবে তুমি
যদি জিজ্ঞেস করেন আল্লাহর নবী
কী ছিল তোমাদের ভূমিকা, হে আমার উত্তরসূরি,
কেমনতরো আচরণ করেছিলে তোমরা আমার বংশধরদের
প্রতি আমার বিদায়ের পর?
যারা বন্দী হয়েছিল, যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল, রক্তের
সমুদ্রে যাদেরকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল,
তাদের প্রতি কেমন ছিল তোমাদের ব্যবহার? তোমাদের
প্রতি আমার নির্দেশতো
কখনো এমন ছিল না যে, তোমরা আমার বংশধরদের
সাথে খেলবে শত্রু শত্রু খেলা?

আর তাঁর স্ত্রী রাবাব যে কবিতায় তাঁর হৃদয়ের শোক-প্রকাশ করেছিলেন তা এই:

কে আর এতিমদের সাহায্য করবে,
কে আর মিটাবে তাদের প্রয়োজন?
কে দেবে আশ্রয় নিপীড়ত জনে?
আলাহর কসম, তাঁর শূন্যস্থানে আমি
মাটি ও কাদায় মিশে না যাওয়া পর্যন্ত
আর কোন পুরুষকে স্বামী রূপে চাই না।

এভাবে আল্লাহর হাবীব হযরতে রাসূলে মকবুল (সা.)-এর প্রিয় নাতি, তাঁর 'রায়হান' বেহেস্তে যুবকদের সরদার হযরত হুসাইন (রাযি.) তাঁর আপন সহোদর হযরত হাসান (রাযি.)-এর অনুগামী হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি আদর্শের জন্য শহীদ হন, যে আদর্শকে তিনি সত্য হিসেবেই মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বীরের মৃত্যুই বরণ করেছেন। অবশ্যই তিনি আপন আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে পার্থিব জীবনের সুখ-শান্তি ক্রয় করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে আদর্শিক ও গৌরবময় মৃত্যুকে

জিল্লতির জীবনের তুলনায় শ্রেয় বলে গণ্য করেছেন। যে মৃত্যুকে কোন প্রাণীই এড়াতে পারে না।

একথা আমরা পূর্বেই জেনেছি যে, তাঁর নিষ্পাপ চেহারার সাথে হুযুর পুরনূর (সা.)-এর চেহারা মুবারকের সাদৃশ্য ছিল। পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্য যারাই আত্মত্যাগে ব্রতী হবেন তাদের সবার জন্যই হযরত হুসাইন (রাযি.) একজন অতি উত্তম আদর্শ।

হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর দৈহিক মৃত্যু হয়েছে সত্য কিন্তু তিনি আধ্যাত্মিকভাবে মুমিন মুসলমানের অন্তরে চিরজীবি হয়ে রয়েছেন। যেভাবে তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে জীবিত আছেন। কারণ তিনি শহীদ, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ۝

‘শহীদদের কোন মৃত্যু নেই। বরং তারা জীবিত ও মহাপ্রভুর কাছ থেকে তারা নিয়মিত রিজিক প্রাপ্ত হন।’[১]

তাঁর চরিত্র

প্রজ্ঞাবান ও অনুপম চরিত্রের অধিকারী হুসাইন (রাযি.)-এর ব্যক্তিত্ব কারো সাথে তুলনা করা যায় না। ইয়াযীদ যখন তার পিতার অসিয়তনামার বদৌলতে মুসলিম উম্মাহর ঘাড়ে চেপে বসে তখন তার এমন কোন গুণ ছিল না যে মানুষ তাকে সানন্দে আমীরুল মুমিনীন হিসেবে মেনে নেবে। যেখানে (সমকালীন সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাহাবী) হযরত আবদুলাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) প্রমুখ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ কেউই তার হাতে বায়াত হননি। প্রকৃতপক্ষে হযরত হাসান (রাযি.) ও হযরত মু‘আবিয়া (রাযি.)-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী হযরত হুসাইন (রাযি.)-ই খিলাফতের একমাত্র হকদার। এ অবস্থায় কীভাবে হযরত হুসাইন (রাযি.) তার অবৈধ অগণতান্ত্রিক শাসন মেনে নেবেন?।

ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী তাঁর *A Short History of the Saracens* ৮৩ পৃষ্ঠায় বলেন, ইয়াযীদ ছিল যেমন নিষ্ঠুর তেমন বিশ্বাসঘাতক; তার কলুষিত মনে দয়াময়া বা সুবিচারের কোন স্থান ছিল না। তার আমোদ-প্রমোদ ছিল যেমন নীচুস্তরের। তার সঙ্গীরা সাথীরাও ছিল তেমনি নিচাশয় ও

---

[১] আল-কুরআন, *আলে ইমরান*, ৩:১৬৯

দুশ্চরিত্র। একটি বানরকে মাওলানার পোশাক পরিয়ে সে ধর্মীয় নেতাদের বিদ্রুপ করত এবং যেখানে যেত সেখানে জন্তুটিকে নিয়ে যেত কারুকার্যময় বস্ত্র সজ্জিত একটি সিরিয় গাধার পিঠে বসিয়ে। তার দরবারে মদ্যপান জনিত হাঙ্গামা হত এবং তা প্রতিফলিত হতো রাজধানী দামেস্কের রাস্তায়। ইয়াযীদ যখন অনৈতিকভাবে রাজসিংহাসনে আরোহন করে তখন তার বয়স মাত্র ৩৭ বছর। আর হযরত হুসাইন (রাযি.) জ্ঞানে গুণে বিভূষিত ৫৬ বছরের এক পরিপূর্ণ কামিল ইনসান। বংশানুক্রমিকভাবে নানা, বাবা ও মায়ের পূত-পবিত্র স্বভাব ও গুণাবলি, সর্বোপরি পিতার বীরত্ব তাঁর মাঝে বিরাজমান ছিল।

ইংরেজ ঐতিহাসিক প্রফেসর সিডিলট হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর সহজ-সরল জীবনের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, তাঁর মধ্যে একটি গুণেরই অভাব ছিল, তা হল ষড়যন্ত্রের মানসিকতা, যা ছিল উমাইয়া বংশীয়দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।'[১]

শাহাদাত লাভের জন্য এমন উদগ্রীব মানুষ এ পৃথিবীতে খুব কমই পরিদৃষ্ট হয়েছে। তিনি বললেন, শরীরের জন্য যদি মৃত্যুই অনিবার্য, তবে আলাহ্‌র পথে শহীদ হওয়ায় মানুষের জন্য উত্তম? জিহাদের জন্য নিজের ধন-সম্পদ পুত্র-পরিজন ও নিজের জীবনকে দৃঢ় চিত্তে, স্থির মস্তিস্কে উৎসর্গ করার মাধ্যমে তিনি তা প্রমাণ করেছেন। জীবন উৎসর্গের এমন এক বিরল দৃষ্টান্ত এ পৃথিবীতে আর একটিও নেই। 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের' খোদায়ী আহ্বানে সাড়া দানের এ অশ্রুতপূর্ব নজীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর চারিত্রিক মাধুর্যের ম্যাগনেটিক পাওয়ার (আকর্ষণ শক্তি) এতই প্রবল ছিল যে, পরম শত্রুও তাঁর মিত্রে পরিনত হয়েছিল। ইয়াযীদ বাহিনীর একাংশের কমাণ্ডার হোর ইবনে ইয়াযীদ (যিনি শুরু থেকে ফোরাত নদীর তীর অবরোধ করে রেখেছিলেন) নিজের জীবন বিপন্ন করে হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর পদতলে নিজেকে সমর্পন করেন। শুধু কি একা! না, ৩০জন ইয়াযীদী সৈন্যসহ। আহলে বাইতের ইজ্জত-আব্রু রক্ষার্থে সম্মুখ সমরে অংশ নিয়ে এ জিন্দাদিল মুজাহিদগণ একে নিজেদেরকে কারবালা প্রান্তরে কুরবান করে দিলেন। প্রথিবীর ইতিহাসে এটি বিরল ঘটনা।

বন্ধু, আত্মীয়-পরিজন, ভাইয়ের সন্তান, নিজের সন্তানদের একের পর এক মৃত্যু (শাহাদাত) প্রত্যক্ষ করেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হযরত হুসাইন (রাযি.)

---

[১] সৈয়দ আমীর আলী, ***A Short History of the Saracens***, পৃ. ৮৪

ক্ষণিকের জন্য বিব্রত বা বিচলিত হননি। নিশ্চিত মরণ জেনেও তাঁর পদযুগল একটুও টলেনি। একবারের জন্যও শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নি। পর্বতসম দৃঢ়তা নিয়ে প্রগাঢ় আস্থার সাথে একাকী শতসহস্র ইয়াযীদী সৈন্যের বিরুদ্ধে সিংহের মত লড়াই করে হাসি মুখে শহীদ হলেন। কিন্তু আল্লাহ ও রাসূল বিরোধী অগণতান্ত্রিক, অবৈধ, স্বৈরশাসকের সাথে হাত মেলাননি। এ অসম, একতরফা চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধে নিজের পরিণতি কি হতে পারে তা পূর্বাহ্নে স্থির করলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, নির্যাতনকারীর আনুগত্য জঘন্যতম অপরাধ। আমি মৃত্যুকে সৌভাগ্য মনে করি। কিন্তু জালিমের সাথে জীবন যাপনকে অন্যায় ছাড়া কিছুই মনে করি না।

কারবালায় কী হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর মৃত্যু হয়েছে? না প্রকৃত মৃত্যু সাধিত হয়েছে ইয়াযীদের। পাপিষ্ঠ ইয়াযীদ ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, পক্ষান্তরে হযরত হুসাইন (রাযি.) কিয়ামত পর্যন্ত মুমিন হৃদয়ে চিরঞ্জীব থাকবেন। হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর পবিত্র খুন কিয়ামত পর্যন্ত সকল মজলুম মুসলমানের হৃদয়ে বিপ্লবের অগ্নিশিখা রূপে প্রজ্জ্বলিত হবে। দেশে দেশে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী রাজা-বাদশাহ, অগণতান্ত্রিক স্বৈরশাসকদের পতন ঘটাবে।

স্বর্গের সরদার (বেহেস্তে যুবকের নেতা) হযরত হাসান (রাযি.) ও হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর সাথে মিলিত হওয়ার ও তাঁদের নেতৃত্বে অনন্তকাল বেহেস্তে বসবাসের এইতো উত্তম সোপান। ইমাম হুসাইন (রাযি.)-এর পূত-পবিত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের মধ্যেই মুসলিম উম্মাহর জীবনের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত। রাসূলে পাক (সা.)-এর সুপ্রসিদ্ধ হাদীস:

«حُسَيْنٌ مِنِّيْ، وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، أَحَبَّ اللهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا».

> 'হুসাইন আমার থেকে আর আমি হুসাইন থেকে। যে হুসাইনকে ভালোবাসে আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। সে আমার দৈহিত্রের একজন। যে আমাকে ভালোবাসে সে যেন হুসাইনকে ভালোবাসে।'[১]

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন কায়েমের লক্ষ্যে আমাদের সবার উচিত ইমাম হুসাইন (রাযি.)-এর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রদর্শন ও তাঁর আদর্শ অনুসরণ। মহান আল্লাহ আহলে বায়তদের শাহাদাত কবুল করুন, তাঁদের মর্যাদা চিরকাল সমুন্নত রাখুন। আমীন।

---

[১] (ক) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৫১, হাদীস: ১৪৪; (খ) ইবনে আসাকির, *তারীখু দামিশক*, খ. ১৪, পৃ. ১৪৮–১৪৯, ক্র. ১৫৬৬

তাঁর বাণী

কোন মানুষের চরিত্র তাঁর কথা, কাজ ও জীবানাচরণ থেকেই যাচাই করা যায়। হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি। তাঁর কিছু এখানে উদ্ধৃত করা হলো। এসব কথা *তারীখে কবীর*, *কাশফুল গুম্মাহ*, *তারীখে ইবনে আসাকির*, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, *রিয়াযুল জান্নাহ* এবং *ইসরারুল হুকামা* প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে উৎকলিত হয়েছে। তিনি বলেছেন,

১. আল্লাহর নিকট এমন এক রেজিস্টার রয়েছে, যাতে ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল গুনাহই লিপিবদ্ধ থাকে।
২. [হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)-কে উদ্দেশ্যে করে] নিজের ছেলের জন্যে আপনার বায়আত এবং সে জন্যে লোকদেরকে পাকড়াও কোনক্রমেই উপেক্ষিত হতে পারে না।
৩. আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি সদা-সর্বদা সন্তুষ্ট থাকাই উত্তম।
৪. ধৈর্য ও সহনশীলতা মানব চরিত্রকে সুসজ্জিত করে।
৫. লোভ ও অধিক প্রাপ্তির আশা শুধুমাত্র খারাপই নয় বরং তা মানুষকে ধ্বংস করে।
৬. বদান্যতা ও নেককাজ আজমত ও বুজুর্গীর উৎকৃষ্টতম মাধ্যম।
৭. ভালো কাজ নিজেই ব্যক্তিকে প্রশংসার যোগ্য করে তোলে।
৮. আল্লাহ পাক দুনিয়াকে পরীক্ষার জন্যে তৈরি করেছেন।
৯. আল্লাহর কিতাবের ওপর আমল, আদল, ইনসাফ, দিয়ানত এবং আলাহর ওপর ভরসা না করা পর্যন্ত কেউই প্রকৃত ঈমানদার হতে পারে না।
১০. সবচেয়ে খারাপ শাসক সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে বিরোধীদের সামনে নতশির ও হিম্মতহীন কিন্তু দুর্বলদের সামনে বাহাদুরীর পারাকাষ্ঠা দেখায়।
১১. যে সম্পদের মাধ্যমে ইজ্জত-আবরু সংরক্ষিত থাকে সে সম্পদই উত্তম সম্পদ।
১২. কাল যদি তোমার উড়িয়ে দেয় তবুও সৃষ্টির প্রতি আকৃষ্ট হবেনা।
১৩. জিল্লতি বরদাশত করার চেয়ে মৃত্যুই উত্তম।
১৪. শরীরের জন্য মৃত্যু অনিবার্য হলেও আল্লাহর পথে শহীদ হওয়াই মানুষের জন্য উত্তম।
১৫. যে ব্যক্তি নিজের মতকে কিয়াসের পাল্লায় মেপে থাকে, সে সন্দেহ সংশয়ে গ্রেফতার হয়।

উপসংহার

মুমিনদের জন্য তিনি এক অনুকরণীয় আদর্শ। ধর্ম ও আদর্শ রক্ষার জন্য তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। ধৈর্য ও ত্যাগের তিনি মূর্তপ্রতীক। প্রচলিত প্রবাদ আছে যে, মৃত্যুকে তালাশ করো, তাহলে জীবনকে খোঁজে পাবে। তিনি এ প্রবাদের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

হযরত হুসাইন (রাযি.) ছিলেন অতি দয়ালু ও মহান দানবীর। মানুষের কোন অনুরোধই তিনি ফিরিয়ে দিতেন না। এমনভাবে দান করতেন তিনি যাতে বুঝা যেত দারিদ্যকে মোটেই তাঁর পরোয়া নেই। তার দুয়ারে যে-ই হাত পাততো সে কখনো বিমুখ হয়ে ফিরে যেত না।

তিনি ছিলেন পাক্কা ঈমানদার, অতি মজবুত ছিল তাঁর ধর্মবিশ্বাস। প্রচণ্ড আল্লাহভীরু, গভীর ধর্মপরায়ণ। আল্লাহর নিষেধের সীমানা অতিক্রমের ভয়ে সর্বদা কম্পমান থাকতো তাঁর দিল।

তিনি ছিলেন একাধারে পুণ্যশীল, রোযাদার, ইবাদাতগুজার। জীবনে বহুবার হজ্ব পালন করেছেন তিনি। তাঁর বদান্যতা সুবিদিত, তাঁর জীবন ছিল সৎকর্মে ভরপুর।

তিনি ছিলেন সাহসী, দৃঢ়তা, অকুতোভয় সৈনিক, সময়ের প্রয়োজনে জানবাজ যোদ্ধা।

তিনি ছিলেন মধূরভাষী, শিল্পিত চেতনার মানুষ। তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত শব্দমালা শ্রোতাদের মোহমুগ্ধ করে রাখত। উপস্থিত বক্তৃতায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তাঁর কাব্য প্রতিভা, বক্তৃতা দানের ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার কথা বাদ দিলেও তিনি ছিলেন একজন উচুঁ স্তরের জ্ঞানী, ইসলামী ব্যবহার (ফিকহ) শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান ছিল কিংবদন্তীতুল্য। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ শিক্ষকও।

তিনি এক মহান আদর্শের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, যে আদর্শের প্রতি তাঁর ছিল অবিচল নিষ্ঠা। তিনি সত্যিকারের বীরের মৃত্যুই বরণ করেছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জি

॥আ ॥

১. *আল-কুরআন আল-করীম*

২. আবু দাউদ : আবু দাউদ, সুলায়মান উবনুল আশআস ইবনে ইসহাক ইবনে বশীর আল-আযদী আস-সিজিসতানী (২০২–২৭৫ হি. = ৮১৭–৮৮৯ খ্রি.), ***আস-সুনান***, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান

৩. আবু নুআইম আল-আসবাহানী: আবু নুআইম, আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুসা ইবনে মিহরান আল-আসবাহানী (৩৬৩–৪৩০ হি. = ৯৪৮–১০৩৮ খ্রি.):
(ক) ***মা'রিফাতুস সাহাবা***, দারুল ওয়াতান, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)
(খ) ***হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া***, আস-সাআদা, মিসর (১৩৯৪ হি. = ১৯৭৪ খ্রি.)

৪. আল-আসকলানী : আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী (৭৭৩–৮২৫ হি. = ১৩৭৪–১৪৪৯ খ্রি.), ***আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

৫. আহমদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল ইবনে হিলাল ইবনে আসাদ আশ-শায়বানী (১৬৪–২৪১ হি. = ৭৮০–৮৫৫ খ্রি.), ***আল-মুসনদ***, মুআস্‌সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)

॥ই ॥

৬. ইবনুল আসীর : ইযযুদ্দীন, আবুল হাসান, আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল করীম ইবনে আবদুল ওয়াহিদ ইবনুল আসীর

আল-জাযারী আশ-শায়বানী (৫৫৫–৬৩০ হি. = ১১৬০–১২৩৩ খ্রি.), ***উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

৭. ইবনে আবু শায়বা : আবু বকর, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ওসমান ইবনে খাওয়াসিতী আবু শায়বা আল-আবাসী (১৫৯–২৩৫ হি. = ৭৭৬–৮৪৯ খ্রি.), ***আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার***, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

৮. ইবনে আসাকির : তকীউদ্দীন, আবুল কাসিম, আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে আসাকির আদ-দিমাশকী (৪৯৯–৫৭১ হি. = ১১০৫–১১৮৬ খ্রি.), ***তারীখু মদীনাতি দামিশক ওয়া যিক্‌রু ফযলিহা ওয়া তাসমিয়াতি মিন হল্লিহা মিনাল আমাসিল আওয়িজতাযু বনূহায়হা মিন ওয়ারিদিয়হা ওয়া আহলিহা***, দারুল ফিকর, দিমাশক, সিরিয়া (১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

৯. ইবনে কসীর : আবুল ফিদা, ইমাদুদ্দীন, ইসমাঈল ইবনে উমর ইবনে কাসীর আল-কুরাশী (৭০১–৭৭৪ হি. = ১৩০২–১৩৭৩ খ্রি.), ***আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া***, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

১০. ইবনে মাজাহ : ইবনে মাজাহ, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আর-রুবায়ী আল-কাযওয়ীনী (২০৯–২৭৩ হি. = ৮২৪–৮৮৭ খ্রি.), ***আস-সুনান***, দারু ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান

১১. ইবনে হিব্বান : আবু হাতিম, মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমদ ইবনে মুআয ইবনে মা'বদ আত-তায়মী আদ-দারিমী আল-বসতী (০০০–৩৫৪ হি. = ০০০–৯৬৫ খ্রি.), ***আস-সহীহ = আল-ইহসান ফী তকরীবি সহীহ ইবনি হিব্বান***, মুআস্‌সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

॥খ॥

১২. আল-খতীবুল বগদাদী : আল-খতীবুল বগদাদী, আবু বকর, আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবিত ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী আল-বগদাদী (৩৯২–৪৬৩ হি. = ১০০২–১০৭২ খ্রি.),

তারীখু মদীনাতিস সালাম ওয়া আখবারু মুহাদ্দিসীহা ওয়া যিকরু কুত্তানিহাল উলামা মিন গায়রি আহলিহা ওয়া আরদীহা = তারীখু বগদাদ, দারুল গারব আল-ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০২ খ্রি.)

১৩. আল-খলীলী : আবুল ইয়া'লা, খলীল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে ইবরাহীম ইবনুল খলীল আল-খাযওয়ীনী (০০০–৪৪৬ হি. = ০০০–১০৫৪ খ্রি.), *আল-ইরশাদ ফী মা'রিফাতি ওলামায়িল হাদীস*, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

॥ত॥

১৪. আত-তাবারানী : আবুল কাসিম, সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে মতীর আল-লাখমী আশ-শামী আত-তাবারানী (২৬০–৩৬০ হি. = ৮৭৩–৯৭১ খ্রি.), *আল-মু'জামুল কবীর*, মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

১৫. আত-তাবারী : আবু জাফর, মুহাম্মদ ইবনে জরীর ইবনে ইয়াযীদ ইবনে গালিব আত-তাবারী (২২৪–৩১০ হি. = ৮৩৯–৯২৩ খ্রি.), *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক = তারীখুত তাবারী*, দারুল মাআরিফ, কায়রো, মিসর (চতুর্থ সংস্করণ: ১৩৮৭ হি. = ১৯৬৭ খ্রি.)

১৬. আত-তিরমিযী : মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মুসা ইবনুয যাহ্হাক আস-সুলামী আয-যরীর আল-বুগী আত-তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি. = ৮২৪–৮৯২ খ্রি.), *আল-জামি'উল কবীর = আস-সুনান*, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স পাবলিশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯৫ হি. = ১৯৭৫ খ্রি.)

॥দ॥

১৭. আদ-দূলাবী : আবু বিশর, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্মাদ ইবনে সায়ীদ ইবনে মুসলিম আল-আনসারী আদ-দূলাবী আর-রাযী (২২৪–৩১০ হি. = ৮৩৯–৯২৩ খ্রি.), *আয-যুররিয়াতুত তাহিরা*, আদ-দারুস সালাফিয়া, কুয়েত (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৭ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

॥ন॥

১৮. আন-নাসায়ী : আবু আবদুর রহমান, আহমদ ইবনে আলী ইবনে শুআইব ইবনে আলী ইবনে সিনান ইবনে বাহর ইবনে দীনার আল-খুরাসানী আন-নাসায়ী আল-কবীর (২১৫–৩০৩ হি. = ৮৩০–৯১৫ খ্রি.), ***আল-মুজতাবা মিনাস সুনান = আস-সুনানুস সুগরা***, মাকতাবুল মতবুআত আল-ইসলামিয়া, হলব, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

॥ব॥

১৯. আল-বায্যার : আবু বকর, আহমদ ইবনে আমর ইবনে আবদুল খালিক ইবনে খাল্লাদ ইবনে উবায়দুল্লাহ আল-আতাকী আল-বায্যার (০০০–২৯২ হি. = ০০০–৯০৫ খ্রি.), ***আল-মুসনদ = আল-বাহরুয যাখ্খার***, মকতবাতুল উলূম ওয়াল হাকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪–১৪২৯ হি. = ১৯৮৮–২০০৯ খ্রি.)

২০. আল-বায়হাকী : আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪–৪৫৮ হি. = ৯৯৪–১০৬৬ খ্রি.), ***দালায়িলুন নুবুওয়াত ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরীয়ত***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

২১. আল-বুখারী : হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী (১৯৪–২৫৬ হি. = ৮১০–৮৭০ খ্রি.), ***আল-জামিউল মুসনদ আস-সহীহ আল-মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি = আস-সহীহ***, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

॥ম॥

২২. আল-মিয্যী : আবুল হাজ্জাজ, জামালুদ্দীন, ইউসুফ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ইউসুফ ইবনুয যকী আবু মুহাম্মদ আল-কাযাযী আল-কলবী আল-মিয্যী (৬৫৪–৭৪২ হি. = ১২৫৬–১৩৪১ খ্রি.), ***তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির***

রিজাল, মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০০ হি. = ১৯৮০ খ্রি.)

২৩. মুসলিম : আবুল হাসান, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুরায়শী আন-নায়শাপুরী (২০৪–২৬১ হি. = ৮২০–৮৭৫ খ্রি.), ***আল-মুসনদুস সহীহিল মুখতাসার বি-নাকলিল আদলি আনিল আদলি ইলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম = আস-সহীহ***, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান

॥য॥

২৪. আয-যাহাবী : শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে কায়মায আয-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দিমাশকী (৬৭৩–৭৪৮ হি. = ১২৭৫–১৩৪৭ খ্রি.), ***সিয়ারু আ'লামিন নুবালা***, মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

॥স॥

২৫. আস-সানআনী : আবু বকর, আবদুর রায্‌যাক ইবনে হুমাম ইবনে নাফি আল-হিময়ারী আস-সানআনী (১২৬–২১১ হি. = ৭৪৪–৮২৭ খ্রি.), ***আল-মুসান্নাফ***, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. = ১৯৮২ খ্রি.)

॥হ॥

২৬. আল-হাকিম : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদাওয়ীয়া ইবনে নু'আইম ইবনুল হাকাম আল-হাকিম (৩২১–৪০৫ হি. = ৯৩৩–১০১৪ খ্রি.), ***আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)

২৭. আল-হায়সামী : আবুল হাসান, নুরুদ্দীন, আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলায়মান আল-হায়সামী আল-কাহিরী আল-মিসরী (৭৩৫–৮০৭ হি. = ১৩৩৫–১৪০৫ খ্রি.), ***মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ***, মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)